ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by B Jyoti Bhante

লেখক ও প্রকাশিকা প্রসঙ্গে –

আমি বিশ্বাস করি, যে কোন ভালো কাজ মানুষকে তথা জীব জগতকে কল্যাণমুখী করে তোলে। বুদ্ধও তাঁর শিষ্যগণকে কল্যাণধর্ম প্রচার করার জন্য, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। "ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর বাণী" বইয়ের লেখক স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর সুচিন্তিত বক্তৃতায়, কর্মকান্ডে, পুস্তকে ভগবান বুদ্ধের আদর্শকে যে ভাবে প্রতিফলন ঘটাবার চেষ্টা করেছেন এই বইটা পড়লে বুঝা যায়। তাই রাউজান উপজেলাস্থ পশ্চিম বিনাজুরী নিবাসী বর্তমানে পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকার সমাজ সচেতন ব্যক্তিত্ব, স্বর্গীয় প্রকৌশলী জ্যোতিরঞ্জন চৌধুরীর সহধর্মিনী, বুদ্ধিমতী রমণী, ধর্মপ্রাণা, ঐতিহ্যবাহী পাহাড়তলী গ্রামের জন্মজাত ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় সুনীল কান্তি মুৎসুদ্দীর জ্যৈষ্ঠ কন্যা শ্রীমতি পূরবী চৌধুরীকে এই ক্ষুদ্র বইখানি প্রজ্ঞালোক-প্রজ্ঞানন্দ প্রকাশনা হতে পুনঃ প্রকাশ করার জন্য উৎসাহিত করলে উনি সানন্দে প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করে নিজেকে অত্যন্ত ধর্মসচেতন নারী হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন এবং সমাজকে একটি ভাল বই উপহার দিয়েছেন। বুদ্ধ বলেছেন- "ধম্মদানং সব্ব দানং জিনাতি" অর্থাৎ ধর্মদান সকল দানকে অতিক্রম করে। এতে প্রজন্ম উৎসাহিত হবে, পুলকিত ও আনন্দবোধ করবে, ধর্মীয় চেতনায় সমৃদ্ধ হবে। অগনন বই প্রেমীর চেতনা সঞ্জীবিত করে কীর্তির মাইল ফলক রচিত করলো প্রকাশিকা। দীর্ঘদিন সুস্থতার মাঝে বেঁচে থাকুক পরিবারের সবার মাঝে তথা আমাদের অন্তরে অন্তরে এবং ভবিষ্যতে অংশ গ্রহণ করুক আমাদের কল্যাণময় কর্মকান্ডে। জয় হোক তব জয়। সকলকে অন্তরের অনাবিল শুভেচ্ছা ও সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনায়–

জিনাংসু বড়ুয়া
নির্বাহী সম্পাদক, 'মুক্তকথা'।

ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশিকার অভিব্যাক্তি

আমার মনের অনেক দিনের সুপ্ত ইচ্ছা প্রয়াত স্বামী প্রকৌশলী জ্যোতিরঞ্জন চৌধুরী মহোদয়ের পূণ্যস্মৃতি স্মরণে একটি ধর্মীয় বই প্রকাশনা করা। হঠাৎ ক'দিন আগে আমার পরম কল্যাণমিত্র 'মুক্তকথা' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক বাবু জিনাংসু বড়ুয়া স্বামী বিবেকানন্দ রচিত "ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর বাণী" বইটি প্রকাশনার জন্য আমাকে অনুপ্রেরণা যোগালে আমি আমার ছেলেসহ বইটি পড়ে দেখি। লেখক বইটি অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় যে ভাবে উপস্থাপনা করেছেন তাতে আমাদের খুব ভাল লেগেছে। এককথায় পাঠকের চোখ খুলে দেয়ার মত এই বইটি। বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে আমার পরিবারের সবাই একমত পোষণ করাতে তাদের সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি। তাই আমার লোকান্তরিত স্বামীর আত্মার নির্বাণ শান্তি কামনার্থে এই বইটি বিনম্র শ্রদ্ধাসহকারে উৎসর্গিত করলাম।

বিশেষকরে শুভার্থী জিনাংসু বাবু বইটি শ্রীবৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট সহযোগিতা করে মহত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। কামনা করি উনার নিরাময় সুস্থ-সুন্দর জীবন।

অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও প্রকাশনার ভুল-ত্রুটি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। এ ব্যাপারে আপনাদের শুভ দৃষ্টি কামনা করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি গৃহী সমাজের কল্যান সাধনে এবং আদর্শ জীবন গঠনে সহায়ক হবে। সকল প্রাণীর সুখ কামনা করে– এ প্রত্যাশায়।

পূরবী চৌধুরী
পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।

সূচীপত্র

বুদ্ধের বাণী	০১
বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ	১১
'এশিয়ার আলোক'–বুদ্ধদেবের ধর্ম	১২
কর্মযোগী ভগবান বুদ্ধ	১৩
বুদ্ধের ধর্ম	১৪
প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম	৫৫
বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্ত	৫৬
বুদ্ধদেব সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার সংকলন	৬০
বৌদ্ধধর্ম	৬৫

সার্বিক তত্ত্বাবধানে :

জিনাংসু বড়ুয়া

নির্বাহী সম্পাদক, 'মুক্তকথা'

বুদ্ধের বাণী

(১৯০০ খ্রীঃ ১৮ মার্চ স্যানফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত ভাষণ)

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম-দার্শনিক দৃষ্টিতে নয়; কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধর্মান্দোলন সর্বাধিক প্রবল আকারে দেখা দিয়েছিল, মানবসমাজের ওপর এই আন্দোলন সবচেয়ে শক্তিশালী আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ফেটে পড়েছিল; এমন কোন সভ্যতা নেই, যার ওপর কোন না কোন ভাবে এর প্রভাব অনুভূত হয়নি।

বুদ্ধের অনুগামীরা খুব উদ্যমী ও প্রচারশীল ছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁরাই সর্বপ্রথম নিজ ধর্মে সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে সন্তুষ্ট না থেকে দূরান্তের ছড়িয়ে পড়েছিলেন। পূর্ব-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণে তাঁরা ভ্রমণ করেছেন। তমসাচ্ছন্ন তিব্বতে তাঁরা প্রবেশ করেছেন; পারস্য, এশিয়া-মাইনরে তাঁরা গিয়েছিলেন; রুশ, পোল্যাণ্ড এবং এমন আরও অনেক পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও তাঁরা গেছেন। চীন, কোরিয়া, জাপানে তাঁরা গিয়েছিলেন; ব্রহ্ম, শ্যাম, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আরও বিস্তৃত ভূখণ্ডে তাঁরা ধর্মপ্রচার করেছিলেন। সামরিক জয়যাত্রার ফলে মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন সমগ্র ভূমধ্য-অঞ্চল ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করলেন, ভারতের মনীষাও তখন এশিয়া ও ইউরোপের বিশাল দেশগুলির মধ্যে বিস্তৃতির পথ খুঁজে পেয়েছিল। বৌদ্ধভিক্ষুরা দেশে দেশে গিয়ে ধর্মপ্রচার করেন, আর তাঁদের শিক্ষার ফলে সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতো কুসংস্কার এবং পুরোহিতদের অপকৌশলগুলি বিদূরিত হতে লাগল।

এই আন্দোলনকে ঠিক ঠিক বুঝতে গেলে, বুদ্ধের আর্বিভাব-কালে ভারতে যে অবস্থা ছিল, তা জানা দরকার-যেমন খ্রীস্টধর্মকে বুঝতে হলে খ্রীস্টের সমকালীন ইহুদী সমাজের অবস্থাটি উপলব্ধি করা আবশ্যক। খ্রীস্ট-জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্বে যখন ভারতীয় সভ্যতার চরম বিকাশ হয়েছিল, সেই ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে আপনাদের কিছু ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

ভারতীয় সভ্যতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অনেকবারই তার পতন ও অভ্যুদয় হয়েছে-এটাই তার বৈশিষ্ট্য। বহু জাতিরই একবার উত্থানের পর পতন হয় চিরতরে। দু-রকম জাতি আছে; এক হচ্ছে ক্রমবর্ধমান, আর এক আছে যাদের উন্নতির অবসান হয়েছে। শান্তিপ্রিয় ভারত ও চীনের পতন হয়, কিন্তু আবার উত্থানও হয়। কিন্তু অন্যান্য জাতিগুলি একবার তলিয়ে গেলে আর ওঠে না-তাঁদের হয় মৃত্যু। শান্তিকামীরাই ধন্য, কারণ শেষ পর্যন্ত তাঁরাই পৃথিবী ভোগ করে।

যে যুগে বুদ্ধের জন্ম সে যুগে ভারতবর্ষে একজন মহান ধর্মনেতার-আচার্যের প্রয়োজন হয়েছিল। পুরোহিতকূল ইতিমধ্যেই খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ইহুদীদের ইতিহাস স্মরণ করলেই বেশ বোঝা যায়, তাঁদের দু-রকম ধর্মনেতা ছিলেন-পুরোহিত এবং ধর্মগুরু[১]; পুরোহিতরা জনসাধারণকে শুধু অন্ধকারেই ফেলে রাখত, আর তাঁদের মনে যত কুসংস্কারের বোঝা চাপাত। পুরোহিতদের অনুমোদিত উপাসনা-পদ্ধতিগুলি ছিল মানুষের উপর আধিপত্য কায়েম রাখবার অপকৌশল মাত্র।

সমগ্র 'ওল্ড টেস্টামেন্টে' (Old Testament) দেখা যায় ধর্মগুরুরা পুরোহিতদের কুসংস্কারগুলির বিরোধিতা করছেন। আর এই বিরোধের পরিণতি হলে ধর্মগুরুদের জয় এবং পুরোহিতদের পতন।

পুরোহিতরা বিশ্বাস করত-ঈশ্বর একজন আছেন বটে, কিন্তু এই ঈশ্বরকে জানতে হলে একমাত্র তাদের সাহায্যেই জানতে হবে; পুরোহিতদের কাছ থেকে ছাড়পত্র পেলেই মানুষ পবিত্র বেদীর কাছে যেতে পারবে। পুরোহিতদের প্রণামী দিতে হবে, পূজা করতে হবে এবং তাঁদেরই হাতে যথাসর্বস্ব অর্পণ করতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে বার বার এই পুরোহিত-প্রাধান্যের অভ্যুত্থান হয়েছে; এই মারাত্মক ক্ষমতা লিপ্সা, এই ব্যাঘ্র-সুলভ তৃষ্ণা সম্ভবতঃ মানুষের একটি আদিম বৃত্তি। পুরেহিতরাই সর্ববিষয়ে কর্তৃত্ব করবে, সহস্র রকম বিধিনিষেধ জারি করবে, সরল সত্যকে নানা জটিল আকারে ব্যাখ্যা করবে, তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক অনেক কাহিনীও শোনাবে। যদি এই জন্মেই প্রতিষ্ঠা চাও অথবা মৃত্যুর পরে স্বর্গে যেতে চাও তো তাঁদের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যত রকম আচার-অনুষ্ঠান আছে, সব করতে হবে। এগুলি জীবনকে এতই জটিল এবং বুদ্ধিকে এতই বিভ্রান্ত করে যে, আমি সোজাসুজিভাবে কোন কথা বললেও আপনারা অতৃপ্ত হয়ে ফিরে যাবেন। ধর্মাচার্যেরা পুরোহিতদের বিরুদ্ধে এবং তাঁদের কুসংস্কার ও মতলব সম্বন্ধে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন, কিন্তু জনসাধারণ এখনও সে সব সতর্কবাণী শুনতে শেখেনি-এখনও তাঁদের অনেক কিছু শিক্ষা করতে হবে।

মানুষকে শিক্ষাগ্রহণ করতেই হবে। আজকাল গণতন্ত্র এবং সাম্যের কথা সকলেই বলে থাকে, কিন্তু একজন যে আর একজনের সমান-এ কথা সে জানবে কি করে? এজন্য তার থাকা চাই-সবল মস্তিষ্ক এবং নিরর্থক ভাবমুক্ত পরিষ্কার মন; সমস্ত অসার সংস্কাররাশিকে ভেদ করে অন্তরের গভীরে যে শুদ্ধ সত্য আছে, তাতেই তার মনকে ভরিয়ে দিতে হবে। তখনই সে জানবে যে, পূর্ণতা ও সমগ্র শক্তি তার মধ্যে আগে থেকেই রয়েছে -অপরকেই এগুলি তাকে

দিতে পারে না। যখনই সে এইটি বোধ করে, সেই মুহূর্তেই সে মুক্ত হয়ে যায়, সে সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে তখন অনুভব করে, প্রত্যেকেই তারই মতো পূর্ণ এবং অন্য ভাইয়ের উপর কোন রকম দৈহিক মানসিক বা নৈতিক ক্ষমতা জাহির করবার কিছুই আর তার থাকে না। তার চেয়ে ছোট কেউ থাকতে পারে-এই ভাবটি সে একেবারে ত্যাগ করে। তখনই সে সাম্যের কথা বলতে পারে, তার পূর্বে নয়।

যাক, যা বলছিলাম, ইহুদীদের মধ্যে পুরোহিত আর ধর্মগুরুদের বিরোধ অবিরাম চলছিল, এবং সব রকম শক্তি ও বিদ্যাকে পুরোহিতরা একচেটিয়া অধিকারে রাখতে সচেষ্ট ছিল, যতদিন না তাঁরা নিজেরাই সেই শক্তি ও বিদ্যা হারাতে আরম্ভ করেছিল; যে শৃঙ্খল তারা সাধারণ মানুষের পায়ে পরিয়ে দেয়, তা তাঁদের নিজেদেরই পায়ে পরতে হয়েছিল। প্রভুরাই শেষ পর্যন্ত দাস হয়ে দাঁড়ায়। এই বিরোধের পরিণতিই হলো ন্যাজারেথবাসী যীশুর বিজয়-এই জয়লাভই হচ্ছে খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস। খ্রীস্ট অবশেষে রাশীকৃত শয়তানি সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করতে পেরেছিলেন। এই মহাপুরুষ পৌরোহিত্যরূপ দানবীয় স্বার্থপরতাকে নিধন করেন এবং তাঁর কবল থেকে সত্যরত্ন উদ্ধার করে বিশ্বের সকলকেই তা দিয়েছিলেন, যাতে যে কেউ সেই সত্য লাভ করতে চায়, স্বাধীনভাবেই সে তা পেতে পারে। এজন্য কোন পুরোহিতের মর্জির অপেক্ষায় তাঁকে থাকতে হবে না।

ইহুদীরা কোন কালেই তেমন দার্শনিক জাতি নয়; ভারতীয়দের মতো সূক্ষ্ম বুদ্ধি তাঁদের ছিল না বা ভারতীয় মননশীলতাও তাঁরা লাভ করেনি। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং আত্মিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রবর্তক তো তাঁরাই, আর সত্যই তাঁরা বিস্ময়কর সব কাজও করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণদের সেই উদার মনোভাবটি লুপ্ত হয়ে গেল। তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকার নিয়ে ঔদ্ধত্য দেখাতে শুরু করলেন। কোন ব্রাহ্মণ যদি কাউকে খুনও করতেন, তবুও তাঁর কোন শাস্তি হতো না। কোন ব্রাহ্মণ তাঁর জন্মগত অধিকার বলেই বিশ্বের অধীশ্বর। এমনকি অতি দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণকেও সম্মান দেখাতে হবে।

কিন্তু পুরোহিতরা যখন বেশ জাঁকিয়ে উঠেছেন, তখন 'সন্ন্যাসী' নামে তত্ত্বজ্ঞ ধর্মাচার্যেরাও ছিলেন। প্রত্যেক হিন্দু, তা তিনি যে বর্ণেরই হোন না কেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের জন্য সব কর্ম পরিত্যাগ করে মৃত্যুরও সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এ সংসার যাঁদের কোনমতেই ভাল লাগে না, তাঁরা গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। পুরোহিতদের উদ্ভাবিত এরূপ দু-হাজার আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে

সন্ন্যাসীরা মোটেই মাথা ঘামান না; যথাঃ কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ কর-দশ অক্ষর, দ্বাদশ অক্ষর ইত্যাদি; এগুলি বাজে জিনিস।

প্রাচীন ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষিরা পুরোহিতদের নির্দেশকে অস্বীকার করে শুদ্ধ সত্য প্রচার করেছিলেন। পুরোহিতদের শক্তিকে তাঁরা বিনষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছু দুই পুরুষ যেতে না যেতেই তাঁদের শিষ্যেরা ঐ পুরোহিতদেরই কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুটিল পথের অনুবর্তন করতে লাগলেন-ক্রমে তাঁরাও পুরোহিত হয়ে দাঁড়ালেন ও বললেন, 'আমাদের সাহায্যেই সত্যকে জানতে পারবে।' এইভাবে সত্য বস্তু আবার কঠিন স্ফটিকার ধারণ করল; সেই শক্ত আবরণ ভেঙে সত্যকে মুক্ত করবার জন্য ঋষিগণ বার বার এসেছেন। হ্যাঁ সাধারণ মানুষ ও সত্যদ্রষ্টা ঋষি-দুই-ই সর্বদা থাকবে, নতুবা মনুষ্যজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

তোমরা অবাক হচ্ছ যে, পুরোহিতদের এতসব জটিল নিয়ম-কানুন কেন? তোমরা সোজাসুজি সত্যের কাছে আসতে পার না কেন? তোমরা কি সত্যকে প্রচার করতে লজ্জিত হচ্ছ, নতুবা এত সব দুর্বোধ্য আচার-বিচারের আড়ালে সত্যকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা কেন? জগতের সম্মুখে সত্যকে স্বীকার করতে পারছ না বলে তোমরা কি ঈশ্বরের কাছে লজ্জিত নও? এই কি তোমাদের ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা? পুরোহিতরাই সত্য-প্রচারের যোগ্য পুরুষ! সাধারণ মানুষ সত্যের যোগ্য নয়? সত্যকে সহজবোধ্য করতে হবে, কিছুটা তরল করতে হবে।

যীশুর শৈলোপদেশ (ঝবৎসড়হ ড়হ ঃযব সড়ঁহঃ) এবং গীতাই ধরা যাক-অতি সহজ সরল সেসব কথা। একজন রাস্তার লোকও তা বুঝতে পারে। কী চমৎকার! সত্য অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সরলভাবেই এখানে প্রকাশিত। কিন্তু না, ঐ পুরোহিতেরা এত সহজেই সত্যকে ধরে ফেলাটা পছন্দ করবে না। তাঁরা দু-হাজার স্বর্গ আর দু-হাজার নরকের কথা শোনাবেই। লোকে যদি তাদের বিধান মেনে চলে, তবে স্বর্গে গতি হবে; আর তাঁদের অনুশাসন না মানলে লোকে নরকে যাবে।

কিন্তু সত্যকে মানুষ ঠিকই জানবে। কেউ কেউ ভয় পান যে, যদি পূর্ণ সত্য সাধারণকে বলে ফেলা হয়, তবে তাঁদের অনিষ্টই হবে। এঁরা বলেন-নির্বিশেষ সত্য লোককে জানানো উচিত নয়। কিন্তু সত্যের সঙ্গে আপসের ভাবে চলেও জগতের এমন কিছু একটা মঙ্গল হয়নি। এ পর্যন্ত যা হয়েছে, তার চেয়ে খারাপ আর কী হবে? সত্যকেই ব্যক্ত কর। যদি তা যথার্থ হয়, তবে অবশ্যই তাতে মঙ্গল হবে। লোকে যদি তাতে প্রতিবাদ করে বা অন্য কোন প্রস্তাব নিয়ে আসে, তাহলে শয়তানের পক্ষই সমর্থন করা হবে।

বুদ্ধের আমলে ভারতবর্ষ এইসব ভাবে ভরে গিয়েছিল। নিরীহ জনসাধারণকে তখন সর্বপ্রকার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। বেদের একটিমাত্র শব্দও কোন বেচারার কানে প্রবেশ করলে তাকে দারুণ শাস্তি ভোগ করতে হতো। প্রাচীন হিন্দুদের দ্বারা দৃষ্ট বা অনুভূত সত্যরাশি বেদকে পুরোহিতরা গুপ্ত সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল।

অবশেষে একজন আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর ছিল বুদ্ধি, শক্তি ও হৃদয়-উন্মুক্ত আকাশের মতো অনন্ত হৃদয়। তিনি দেখলেন জনসাধারণ কেমন করে পুরোহিতদের দ্বারা চালিত হচ্ছে, আর পুরোহিতরাও কিভাবে শক্তিমত্ত হয়ে উঠেছে। এর একটা বিহিত করতেও তিনি উদ্যোগী হলেন। কারও ওপর কোন আধিপত্য বিস্তার করতেও তিনি চাননি। মানুষের মানসিক বা আধ্যাত্মিক সব রকম বন্ধনকে চূর্ণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর হৃদয়ও ছিল বিশাল। প্রশস্ত হৃদয়-আমাদের মধ্যে আরও অনেকেরই আছে এবং সকলকে সহায়তা করতে আমরাও চাই। কিন্তু আমাদের সকলেরই বুদ্ধিমত্তা নেই; কি উপায়ে কিভাবে সাহায্য করা যায়, তা জানা নেই। মানবাত্মার মুক্তির পথ উদ্ভাবন করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি এই মানুষটির ছিল। লোকের কেন এত দুঃখ-তা তিনি জেনেছিলেন, আর এই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সর্বগুণান্বিত মানুষ ছিলেন তিনি, সব কিছুর সমাধান করেছিলেন তিনি। তিনি নির্বিচারে সকলকেই উপদেশ দিয়ে বোধিলব্ধ শান্তি উপলব্ধি করতে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন। ইনিই মহামানব বুদ্ধ।

তোমরা আর্নলড-এর 'এশিয়ার আলো' (The Light of Asia)[১] কাব্যে পড়েছ : বুদ্ধ একজন রাজপুত্র ছিলেন এবং জগতের দুঃখ তাঁকে কত গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল ; ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত হলেও নিজের ব্যক্তিগত সুখ ও নিরাপত্তা তাঁকে মোটেই শান্তি দিতে পারেনি; পত্নী ও নবজাত শিশুসন্তানকে রেখে কিভাবে তিনি সংসার ত্যাগ করেন; সত্যানুন্ধানের উদ্দেশ্যে সাধু-মহাত্মাদের দ্বারে দ্বারে তিনি কতই ঘুরেছিলেন এবং অবশেষে কেমন করে বোধিলাভ করলেন। তাঁর বিশাল ধর্মান্দোলন, শিষ্যমণ্ডলী এবং ধর্ম-সঙ্ঘের কথাও তোমরা জান। এসবই জানা কথা।

ভারতে পুরোহিত ও ধর্মাচার্যদের মধ্যে যে বিরোধ চলছিল, বুদ্ধ তার মূর্তিমান বিজয়রূপে দেখা দিলেন। ভারতবর্ষীয় পুরোহিতদের সম্পর্কে একটি কথা কিন্তু বলে রাখা দরকার-তাঁরা কোনদিনই ধর্মের ব্যাপারে অসহিষ্ণু ছিলেন না; ধর্মদ্রোহিতাও তাঁরা করেননি কখনো। যে কেউ তাঁদের বিরুদ্ধে অবাধে প্রচার করতে পারত। তাঁদের ধর্মবুদ্ধি এরকম ছিল যে, কোন ধর্মমতের জন্য

তাঁরা কোনকালে কাউকে নির্যাতিত করেননি। কিন্তু পুরোহিতকূলের অদ্ভুত দুর্বলতা তাঁদের পেয়ে বসেছিল; তাঁরাও ক্ষমতালোভী হলেন, নানা আইন-কানুন বিধি-বিধান তৈরি করে ধর্মকে অনাবশ্যকভাবে জটিল করে তুলছিলেন, আর এই ভাবেই তাঁদের ধর্মের যারা অনুগামী, তাঁদের শক্তিকে খর্ব করে দিয়েছিলেন।

ধর্মের এই সব বাড়াবাড়ির মূলোচ্ছেদ করলেন বুদ্ধ। অতিশয় স্পষ্ট সত্যকে তিনি প্রচার করেছিলেন। নির্বিচারে সকলের মধ্যে তিনি বেদের সারমর্ম প্রচার করেছিলেন ; বৃহত্তর জগৎকেও তিনি এই শিক্ষা দেন, কারণ তাঁর সমগ্র উপদেশাবলীর মধ্যে মানব-মৈত্রী অন্যতম। মানুষ সকলেই সমান, বিশেষ অধিকার কারও নেই। বুদ্ধ ছিলেন সাম্যের আচার্য। প্রত্যেক নর-নারীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনে সমান অধিকার- এই ছিল তাঁর শিক্ষা। পুরোহিত ও অপরাপর বর্ণের মধ্যে ভেদ তিনি দূর করেন। নিকৃষ্টতম ব্যক্তিও উচ্চতম আধ্যাত্মিক রাজ্যের যোগ্য হতে পেরেছিল; নির্বাণের উদার পথ তিনি সকলের জন্যই উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের মতো দেশেও তাঁর বাণী সত্যই খুব বলিষ্ঠ। যত প্রকার ধর্মই প্রচার করা হোক, কোন ভারতীয়ই তাতে ব্যথিত হয় না। কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ হজম করতে ভারতকে একটু বেগ পেতে হয়েছিল আপনাদের কাছে তা আরও কত কঠিন লাগবে!

তাঁর বাণী ছিল এই : আমাদের জীবনে এত দুঃখ কেন? কারণ আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর। আমরা শুধু নিজেদেরই জন্য সব কিছু বাসনা করি-তাই তো এত দুঃখ। এ থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কী? আত্মবিসর্জন। 'অহং' বলে কিছু নেই-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই ক্রিয়াশীল জগৎ মাত্র আছে। জীবন-মৃত্যুর গতাগতির মূলে 'আত্মা' বলে কিছুই নেই। আছে শুধু চিন্তাপ্রবাহ, একটির পর আর একটি সঙ্কল্প। সঙ্কল্পের একটি ফুট উঠল, আবার বিলীন হয়ে গেল সেই মুহূর্তেই-এইমাত্র। এই চিন্তা বা সঙ্কল্পের একটি কর্তা কেউ নেই-কোন জ্ঞাতাও নেই। দেহ অনুক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে-মন এবং বুদ্ধিও পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং 'অহং' নিছক ভ্রান্তি। যত স্বার্থপরতা, তা এই 'অহং'-মিথ্যা 'অহং'কে নিয়েই যদি জানি যে 'আমি' বলে কিছু নেই, তাহলেই আমরা নিজেরা শান্তিতে থাকব এবং অপরকেও সুখী করতে পারব।

এই ছিল বুদ্ধের শিক্ষা। তিনি শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি ; জগতের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'পশুবলি যদি কল্যাণের হয়, তবে তো মনুষ্যবলি অধিকতর কল্যাণের'- এবং নিজেকেই তিনি যূপকাষ্ঠে বলি দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'পশুবলি'

হচ্ছে অন্যতম কুসংস্কার। ঈশ্বর আর আত্মা-এ দুটিও কুসংস্কার। ঈশ্বর হচ্ছেন পুরোহিতদের উদ্ভাবিত এক কুসংস্কার মাত্র। পুরোহিতদের কথা মতো যদি সত্যই কোন একজন ঈশ্বর থাকেন, তবে জগতে এত দুঃখ কেন? তিনি তো দেখছি আমারই মতো কার্য-কারণের অধীন। যদি তিনি কার্যকারণের অতীত, তাহলে সৃষ্টি করেন কিসের জন্য? এ রকম ঈশ্বর মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। স্বর্গে বসে একজন শাসক তাঁর আপন মর্জি অনুযায়ী দুনিয়াকে শাসন করছেন, এবং আমাদের এখানে ফেলে রেখে দিয়েছেন শুধু জ্বলে-পুড়ে মরবার জন্য-আমাদের দিকে করুণায় ফিরে তাকাবার মতো এক মুহূর্ত অবসরও তাঁর নেই ! সমগ্র জীবনটাই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের; কিন্তু তাও যথেষ্ট শাস্তি নয়-মৃত্যুর পরেও আবার নানা স্থানে ঘুরতে হবে এবং আরও অন্যান্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। তথাপি এই বিশ্বস্রষ্টাকে খুশি করবার জন্য আমরা কতই না যাগযজ্ঞ ক্রিয়া-কাণ্ড করে চলেছি !'

বুদ্ধ বলেছেন : এ-সব আচার-অনুষ্ঠান-সবই ভুল। জগতে আদর্শ মাত্র একটিই। সব মোহকে বিনষ্ট কর ; যা সত্য তাই শুধু থাকবে। মেঘ সরে গেলেই সূর্যালোক ফুটে উঠবে। 'অহং'-এর বিনাশ কিভাবে হবে? সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও ; একটি সামান্য পিপীলিকার জন্যও প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাক। কোন কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে কর্ম করবে না, কোন ভগবানকে খুশি করবার জন্যও নয় বা কোন পুরস্কারের লোভেও নয়-কারণ শুধু অহংকে বিনাশ করে তুমি নিজের নির্বাণ চাইছ! পূজা-উপাসনা এ-সব নিতান্ত অর্থহীন। তোমরা সবাই বল 'ভগবানকে ধন্যবাদ'- কিন্তু কোথায় তিনি? কেউই জান না, অথচ 'ভগবান, ভগবান' করে সবাই মেতে উঠেছে।

হিন্দুরা তাদের ঈশ্বর ছাড়া আর সব-কিছুই ত্যাগ করতে পারে। ঈশ্বরকে অস্বীকার করার মানে ভক্তির মূল উৎপাটন করা। ভক্তি ও ঈশ্বরকে হিন্দুরা আকঁড়ে থাকবেই। তাঁরা কখনই এ দুটি পরিত্যাগ করতে পারে না। আর বুদ্ধের শিক্ষায় দেখ-ঈশ্বর বলে কেউ নেই, আত্মা কিছু নয়, শুধু কর্ম। কিসের জন্য? 'অহং'-এর জন্য নয়, কেন না তাও এক ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি দূর হলেই আমরা আমাদের নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হব। জগতে এমন লোক সত্যই মুষ্টিমেয়, যারা এতখানি উচুঁতে উঠতে পারে এবং নিছক কর্মের জন্যই কর্ম করে।

তথাপি এই বুদ্ধের ধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। এর একমাত্র কারণ বিস্ময়কর ভালবাসা, যা মানব-ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি মহৎ হৃদয়কে বিগলিত করেছিল-শুধু মানুষের সেবায় নয়, সর্ব প্রাণীর সেবায় যা নিবেদিত

হয়েছিল, যে ভালবাসা সাধারণের দুঃখমোচন ভিন্ন অপর কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখে না।

মানুষ ভগবানকে ভালবাসছিল, কিন্তু মনুষ্য-ভ্রাতাদের কথা ভুলেই গিয়েছিল। ঈশ্বরের জন্য মানুষ নিজের জীবন পর্যন্ত বলি দিতে পারে, আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের নামে সে নরহত্যাও করতে পারে। এই ছিল জগতের অবস্থা। ভগবানের মহিমার জন্য তারা পুত্র বিসর্জন দিত, দেশ লুণ্ঠন করত, সহস্র জীবহত্যা করত, এই ধরিত্রীকে রক্তস্রোতে প্লাবিত করত ভগবানেরই জয় দিয়ে। এই সর্বপ্রথম তারা ফিরে তাকাল ঈশ্বরের অপর মূর্তি মানুষের দিকে। মানুষকেই ভালবাসতে হবে। এই হলো সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য গভীর প্রেমের প্রথম প্রবাহ-সত্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রথম তরঙ্গ যা ভারতবর্ষ থেকে উত্থিত হয়ে ক্রমশঃ উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমের নানা দেশকে প্লাবিত করেছে।

সত্য যেন সত্যেরই মতো ভাস্বর থাকে, এটিই ছিল এই আচার্যের ইচ্ছা। কোন রকম নতি বা আপসের বালাই নেই ; কোন পুরোহিত, কোন ক্ষমতাসম্পন্ন লোক, কোন রাজার তোষামোদ করবারও আবশ্যক নেই। কোন কুসংস্কারমূলক আচারের কাছে-তা যত প্রাচীনই হোক না কেন, কারও মাথা নোয়াবার প্রয়োজন নেই ; সুদূর অতীতকাল থেকে চলে আসছে বলেই কোন অনুষ্ঠান বা পুঁথিকে মেনে নিলে চলবে না। সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ এবং ধর্মীয় তন্ত্র-মন্ত্র তিনি অস্বীকার করেছেন। এমনকি যে সংস্কৃত ভাষায় বরাবর ভারতবর্ষে ধর্মশিক্ষা চলে আসছিল, তাও তিনি বর্জন করেছিলেন, যাতে তাঁর অনুগামীরা ঐ ভাষার সঙ্গে সংযুক্ত সংস্কারগুলি কোনরূপে গ্রহণ করতে না পারে।

যে তত্ত্বটি এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম তাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা যায়-হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। আমরা বলি, বুদ্ধের এই আত্মত্যাগের শিক্ষাকে আমাদের দৃষ্টিতে বিচার করলে আরও ভাল করে বুঝতে পারা যাবে। উপনিষদে আত্মা ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে গভীর তত্ত্বের কথা আছে। আত্মা আর পরব্রহ্ম অভিন্ন। যা কিছু সবই আত্মা-একমাত্র আত্মাই সৎ-বস্তু। মায়াতে আমরা আত্মাকে বহু দেখি। আত্মা কিন্তু এক, বহু নয়। সেই এক আত্মাই নানারূপে প্রতিভাত হয়। মানুষ মানুষের ভাই, কারণ সব মানুষই এক। বেদ বলেন : মানুষ শুধু আমার ভাই নয়, সে আমার স্বরূপ। বিশ্বের কোন অংশকে আঘাত করে আমি নিজেকেই আঘাত করি। আমিই বিশ্বজগৎ। আমি যে ভাবি, আমি অমুক-ইহাই মায়া। প্রকৃত স্বরূপের দিকে যতই অগ্রসর হবে, এই মায়াও ততই দূরে যাবে। বিভিন্নত্ব ও ভেদবুদ্ধি যতই লোপ পাবে, ততই বোধ করবে যে সবই এক পরমাত্মা। ঈশ্বর আছেন, কিন্তু দূর আকাশে অবস্থান করছেন-এমন

একজন কেউ নন তিনি। তিনি শুদ্ধ আত্মা। কোথায় তাঁর অধিষ্ঠান? তোমার অন্তরের অন্তস্থলেই তিনি রয়েছেন; তিনিই হচ্ছেন অন্তরাত্মা। তোমার নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করে কিভাবে তাঁকে ধারণা করবে? যখন তুমি তাঁকে তোমা থেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবছ, তখন তাঁকে জানতে পার না ; 'তুমিই তিনি'- এটিই ভারতীয় ঋষিদের বাণী।

তুমি অমুককে দেখছ-এবং জগতের সবই তোমা থেকে পৃথক, এ রকম ভাব নিছক স্বার্থপরতা। তুমি মনে কর, তুমি আর আমি ভিন্ন। আমার কথা তুমি একটুও ভাব না। তুমি ঘরে গিয়ে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লে। আমি মরে গেলেও তোমার ভোজন পান ও আনন্দ ঠিকই থাকে। কিন্তু সংসারের বাকি লোক যখন কষ্ট পায়, তখন তুমি সুখ ভোগ করতে পার না। আমরা সকলেই এক। বৈষম্যের ভ্রমই যত দুঃখের মূল। আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই–কিছুই নেই !

বুদ্ধের শিক্ষা হলো–ঈশ্বর বলে কিছু নেই, মানুষই সব। ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রচলিত যাবতীয় মনোভাবকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, এই মনোভাব মানুষকে দুর্বল এবং কুসংস্কারাচ্ছন্নকরে! সব-কিছুর জন্য যদি ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করবে, তাহলে কে আর কর্ম করতে বেরোচ্ছে, বল? যারা কর্ম করে, ঈশ্বর তাদেরই কাছে আসেন। যারা নিজেদের সাহায্য করে, ভগবান তাদেরই সাহায্য করেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্য ধারণা আমাদের স্নায়ুমন্ডলীকে শিথিল ও পেশীগুলোকে দুর্বল করে দেয়, আর আমাদের পরনির্ভরশীল করে তোলে। যেখানে স্বাধীনতা, সেইখানেই শান্তি; যখনই পরাধীনতা, তখনই দুঃখ। মানুষের নিজের মধ্যে অনন্ত শক্তি এবং সে তা বোধ করতে পারে-সে উপলব্ধি করতে পারে যে, সে-ও অনন্ত আত্মা। নিশ্চয়ই তা সম্ভব, কিন্তু তোমরা তো বিশ্বাস কর না। তোমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছ, আবার সর্বদা নিজেদের বারুদও তাজা রাখছ।

বুদ্ধের শিক্ষা ঠিক বিপরীত। মানুষকে আর কাদঁতে দিও না। পূজা-প্রার্থনার কোন দরকার নেই। ভগবান তো আর দোকান খুলে বসেননি? প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে তুমি ভগবানেরই উপাসনা করছ। আমি যে কথা বলছি, এও এক উপাসনা; আর তোমরা যে শুনছ, সেও একরকম পূজা। তোমাদের কি এমন কোন মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়া আছে, যার দ্বারা তোমরা সেই অনন্ত শক্তিমান ইশ্বরের ভজনা করছ না? সব ক্রিয়াই তাঁর নিরন্তর উপাসনা। যদি ভেবে থাক, কতকগুলি শব্দই হচ্ছে পূজা, তাহলে সে পূজা নিতান্তই বাহ্য। এমন পূজা-প্রার্থনা মোটেই ভাল না, তাতে কখনো কোন প্রকৃত ফল পাওয়া যায় না।

প্রার্থনা মানে কি কোন রকম পরিশ্রম না করে শুধু তা উচ্চারণ করলেই তুমি আশ্চর্য ফল লাভ করবে? কখনই না। সকলকেই পরিশ্রম করতে হবে : অনন্ত শক্তির গভীরে সকলকেই ডুব দিতে হবে। ধনী-দরিদ্র সবারই ভিতরে সেই একই অনন্ত শক্তি। একজন কঠোর শ্রম করবে, আর একজন কয়েকটি কথা বার বার বলে ফল লাভ করবে-এ মোটেই সত্য নয়। এ বিশ্বজগৎ একটি নিরন্তর প্রার্থনা। যদি এই অর্থে প্রার্থনাকে বুঝতে চেষ্টা কর, তবেই তোমাদের সঙ্গে আমি একমত। কথার প্রয়োজন নেই ; নীরব পূজা বরং ভাল।

এই মতবাদের যর্থাথ মর্ম কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বোঝে না। ভারতবর্ষে আত্মা সম্বন্ধে কোন-রকম আপসের অর্থ পুরোহিত-মণ্ডলীর হাতে সব ক্ষমতা তুলে দেওয়া, এবং আচার্যদের সমস্ত শিক্ষা ভুলে যাওয়া। বুদ্ধ এ কথা জানতেন; তাই তিনি পুরোহিত-অনুশাসিত সর্বপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করেছিলেন এবং মানুষকে তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলেন। জনসাধারণের অভ্যস্ত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে তাঁর দাঁড়াবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল; অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন তাঁকে আনতে হয়েছিল। ফলে এই যাগ-যজ্ঞমূলক ধর্ম ভারত থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায়, কোনকালেই তার পুনরাভ্যুদয় হলো না।

বৌদ্ধ ধর্ম আপাতদৃষ্টিতে ভারতবর্ষ থেকে নির্বাসিত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হয়নি। বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে একটি বিপদের বীজ ছিল-বৌদ্ধধর্ম ছিল সংস্কার-মূলক। ধর্ম-বিপ্লব আনবার জন্য তাঁকে অনেক নাস্তিবাচক শিক্ষাও দিতে হয়েছিল। কিন্তু কোন ধর্ম যদি নাস্তি-ভাবের দিকে বেশি জোর দেয়, তার সম্ভাব্য বিলুপ্তির আশঙ্কাও থাকবে সেখানেই। শুধুমাত্র সংশোধনের দ্বারাই কোন সংস্কারমূলক সম্প্রদায় টিকে থাকতে পারে না-সংগঠনী উপাদানই হচ্ছে যথার্থ প্রেরণা-যা তার মূল প্রেরণা। সংস্কারের কাজগুলি সম্পন্ন হবার পরই অস্তি-ভাবমূলক কাজের দিকে জোর দেওয়া উচিত; বাড়ি তৈরি হয়ে গেলেই ভারা খুলে ফেলতে হয়।

ভারতবর্ষে এমন হয়েছিল যে, কালক্রমে বুদ্ধের অনুগামীর তার নাস্তি-ভাবমূলক উপদেশগুলির প্রতি বেশিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়, ফলে তাঁদের ধর্মের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। নাস্তি-ভাবের প্রকোপে সত্যের বিণাশমূলক মনোভাব আবির্ভূত হয়েছিল, ভারতবর্ষ সেগুলি প্রত্যাখ্যান করে। ভারতের জাতীয় ভাবধারার অনুশাসনই এই।

ঈশ্বর বলে কেউ নেই এবং আত্মাও নেই-বৌদ্ধধর্মের এইসব নাস্তি-ভাব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমি বলি-একমাত্র ঈশ্বরই আছেন; এটা সন্দেহাতীত দৃঢ়

উক্তি। তিনিই একমাত্র সদ্‌বস্তু। বুদ্ধ যেমন বলেন, আত্মা বলে কিছু নেই, আমিও বলি, 'মানুষ তুমি বিশ্বের সহিত ওতপ্রোত হয়ে আছ; তুমিই সব।' কত বাস্তব! সংস্কারের উপাদান নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু সংগঠনী বীজ চিরকালের জন্য সজীব আছে। বুদ্ধ নিম্নজাতীয় প্রাণীদের প্রতিও করুণা শিখিয়ে গেছেন, তারপর থেকে ভারতে এমন কোন সম্প্রদায়ই নেই, যারা সর্বজীবে, এমনকি পশুপক্ষীদের প্রতিও করুণা করতে শেখায়নি। এই দয়া, ক্ষমা, করুণাই হলো বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ জিনিস।

বুদ্ধ-জীবনের একটা বিশেষ আবেদন আছে। আমি সারা জীবন বুদ্ধের অত্যন্ত অনুরাগী, তবে তাঁর মতবাদের নই। অন্য সব চরিত্রের চেয়ে এঁর চরিত্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অধিক। আহা, সেই সাহসিকতা, সেই নির্ভীকতা, সবই গভীর প্রেম! মানুষের কল্যাণের জন্যই তাঁর জন্ম! সবাই নিজের জন্য ঈশ্বরকে খুঁজছে, কত লোকই সত্যানুসন্ধান করছে; তিনি কিন্তু নিজের জন্য সত্যলাভের চেষ্টা করেননি। তিনি সত্যের সন্ধান করেছেন মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে। কেমন করে মানুষকে সাহায্য করবেন, এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। সারা জীবন তিনি কখনো নিজের ভাবনা ভাবেননি। এত বড় মহৎ জীবনের ধারণ আমাদের মতো অজ্ঞ স্বার্থান্ধ সঙ্কীর্ণচিত্ত মানুষ কি করে করতে পারে?

তারপর তাঁর আশ্চর্য বুদ্ধির কথাও ভেবে দেখ। কোন রকম ভাবাবেগ নেই। সেই বিশাল মস্তিষ্কে কুসংস্কারের লেশও ছিল না। প্রাচীন পুঁথিতে লেখা আছে, পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গেছে অথবা বন্ধুরা বিশ্বাস করতে বলছে-এই সব কারণেই বিশ্বাস করো না; তুমি নিজেই বিচার করে দেখ, নিজেই সত্যানুসন্ধান কর; নিজেই অনুভব কর। তারপর যদি তুমি তা অন্যের বা বহুর পক্ষে কল্যাণপ্রদ মনে কর, তখন তা মানুষের মধ্যে বিতরণ কর। কোমল মস্তিষ্ক ক্ষীণমতি দুর্বলচিত্ত কাপুরুষেরা কখনো সত্যকে জানতে পারে না। আকাশের মতো উদার ও মুক্ত হওয়া চাই। চিত্ত হবে নির্মল স্বচ্ছ, তবেই তাতে সত্য প্রতিভাত হবে। কী কুসংস্কাররাশিতে পরিপূর্ণ আমরা সবাই? তোমাদের দেশেও, যেখানে তোমরা নিজেদের খুবই শিক্ষিত বলে ভাব, কী সঙ্কীর্ণতা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তোমরা! ভেবে দেখ, তোমাদের এত সভ্যতার গর্ব সত্ত্বেও আমি নিতান্ত হিন্দু বলেই কোন এক অনুষ্ঠানে আমাকে বসতে আসন দেওয়া হয়নি।

খ্রীস্টের জন্মের ছ-শ বছর আগে বুদ্ধ যখন জীবিত ছিলেন, ভারতবাসীরা অবশ্যই আশ্চর্য রকম শিক্ষিত ছিল; নিশ্চয়ই তারা অত্যন্ত উদার ছিল। বিশাল জনতা বুদ্ধের অনুগামী হয়েছিল, নৃপতিরা সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন, রাণীরা

সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। এত বিপ্লবাত্মক এবং যুগ যুগ ধরে প্রচারিত পুরোহিতদের শিক্ষার চেয়ে এত ভিন্ন তাঁর শিক্ষা ও উপদেশগুলিকে জনসাধারণ সহজেই সমাদর ও গ্রহণ করতে পেরেছিল। অবশ্য তাঁদের মনও ছিল উন্মুক্ত ও প্রশস্ত, যা সচরাচর দেখা যায় না।

এইবার তাঁর পরিনির্বাণের কথা চিন্তা কর। তাঁর জীবন যেমন মহৎ মৃত্যুও ছিল তেমনি মহৎ। তোমাদের আমেরিকায় আদিম অধিবাসীদের মতোই কোন জাতের একটি লোকের দেওয়া খাদ্য তিনি গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুরা এই জাতের লোকদের স্পর্শ করে না, কারণ তার নির্বিচারে সবকিছুই খায়। তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন, 'তোমরা এ খাদ্য খেও না, কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। লোকটির কাছে গিয়ে বল আমার জীবনে এক মহৎ কর্তব্য সে পালন করেছে -সে আমাকে দেহ-মুক্ত করে দিয়েছে।' এক বৃদ্ধ বুদ্ধকে দর্শন করবার আশায় কয়েক ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে এসে কাছে বসেছিল। বুদ্ধ তাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। জনৈক শিষ্যকে কাঁদতে দেখে, তিনি তিরস্কার করে বললেন, 'এ কী? আমার এত উপদেশের এই ফল? কোন মিথ্যা বন্ধনে তোমরা জড়িও না, আমার ওপর কিছুমাত্র নির্ভর করো না, এই নশ্বর শরীরটার জন্য বৃথা গৌরবের প্রয়োজন নেই, বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নন, তিনি উপলব্ধি-স্বরূপ। নিজেরাই নিজেদের নির্বাণ লাভ কর।'

এমনকি অন্তিমকালেও তিনি নিজের জন্য কোন প্রতিষ্ঠা দাবি করেননি। এই কারণেই আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট হচ্ছেন উপলব্ধির এক একটি অবস্থার নামমাত্র। লোক-শিক্ষকদের মধ্যে বুদ্ধই আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতে সব-চেয়ে বেশি করে শিক্ষা দিয়েছেন; শুধু মিথ্যা 'অহং'-এর বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত করেননি, অদৃশ্য ঈশ্বর বা দেবতাদের উপর নির্ভরতা থেকেও মুক্ত করেছেন। মুক্তির সেই অবস্থা–যাকে তিনি নির্বাণ বলতেন তা লাভ করবার জন্য প্রত্যেককেই আহ্বান করেছিলেন। একদিন সে-অবস্থায় সকলেই উপনীত হবে; এবং সেই নির্বাণে উপনীত হওয়াই হচ্ছে মনুষ্য-জীবনের চরম সার্থকতা।

বৌদ্ধভারত

(শেক্‌স্‌পীয়র ক্লাব, পাসাডেনা, ক্যালিফোর্নিয়া-২ ফেব্রুয়ারী, ১৯০০, সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

আপনারা অনেকেই হয়তো এডুইন আরনল্ডের পদ্যে লিখিত বুদ্ধের জীবনী পাঠ করেছেন। কেউ কেউ হয়তো এ-বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনাও করে থাকবেন। কারণ ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি নানা ভাষায় বৌদ্ধ-সাহিত্যের উপর প্রচুর পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মই জগতে সার্বভৌম ধর্মের প্রথম অভিব্যক্তি। সুতরাং এর অনুশীলন স্বতই বিশেষ আকর্ষণীয়।

বৌদ্ধধর্মে পূর্বেও ভারতে এবং অন্যত্র নানা ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে কিন্তু সেগুলি অল্পবিস্তর নিজ নিজ জাতির পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দু, ইহুদী, পারসীক প্রভৃতি প্রাচীন জাতির প্রত্যেকেরই মহান ধর্ম ছিল। কিন্তু সে-সবই মোটের উপর জাতি-বিশেষের নিজস্ব ধর্ম-সার্বভৌম ধর্ম নয়। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মের বিশ্ববিজয়রূপ বিচিত্র একটি অভিযানের সূত্রপাত। যে মতবাদ ও বাণী বৌদ্ধধর্মে প্রচারিত হয়েছিল, যে সত্যসমূহ তার শিক্ষার অঙ্গীভূত–সে-সবের কথা বাদ দিলেও ধর্মজগতে সেই প্রথম এক বিপুল বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। সে ধর্মের জন্মলগ্নের কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধশ্রমণগণ নগ্নপদে ও মুণ্ডিতমস্তকে তৎকালীন সভ্যজগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, এমনকি ল্যাপল্যাণ্ডের এক প্রান্ত থেকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অপর প্রান্ত অবধি তাঁরা প্রচার করেছিল। এইভাবে বুদ্ধদেবের জন্মের অল্প কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তাঁরা নানাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং মূল ভারতভূখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম এক সময়ে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নরনারীকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তবে ভারতবর্ষ কখনো সমগ্রভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেনি। সে ধর্মের পরিধির বহির্ভাগেই ভারতবর্ষ দণ্ডায়মান ছিল। ফলে খ্রীষ্টধর্ম ইহুদীদের মধ্যে যে পরিণতি লাভ করেছিল, অর্থাৎ অধিকাংশ ইহুদী খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেনি-বৌদ্ধধর্মও ভারতবর্ষে অনুরূপ পরিণতিই লাভ করেছিল এবং এভাবেই প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের অব্যাহত ছিল।

কিন্তু তুলনাটির পরিসমাপ্তি এখানেই। কারণ খ্রীস্টধর্ম ইহুদী জাতিকে নিজ পরিধির মধ্যে গ্রহণ করতে সমর্থ না হলেও সমগ্র দেশকে নিজ প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করেছিল-যে-সব স্থানে প্রাচীন ইহুদীধর্ম প্রচলিত ছিল–অতি অল্পকাল মধ্যে খ্রীস্টধর্ম সে-সব স্থানেও প্রবেশ করে তাকে যেন বাতিল করে দিয়েছিল।

সেজন্য প্রাচীন ইহুদীধর্ম শুধু বিক্ষিপ্তভাবেই পৃথিবীর এখানে সেখানে টিকে থাকল। কিন্তু ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মরূপী শিশুটিকে তার প্রসূতি নিজেই যেন গ্রাস করে ফেলেছিল এবং আজ বুদ্ধের নামও যেন ভারতবর্ষে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে আজ সে-দেশের অধিকাংশ নরনারী অপেক্ষা আপনারাই হয়তো বৌদ্ধধর্মের কথা বেশি অবগত আছেন। তার বড়জোর সেই মহাপুরুষের নামটি মাত্র শ্রবণ করেছে। তিনি একজন বিশিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন, ভগবানের অবতার ছিলেন-এই পর্যন্ত সংবাদ তাঁরা হয়তো রাখে, এর অতিরিক্ত আর কিছু নয়।

সিংহল অবশ্য আজও বুদ্ধদেবের সাম্রাজ্য, এবং হিমালয়ের কোন কোন অংশেও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা এখনও কিছু আছে। এছাড়া ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তবে ভারতের বাইরে, এশিয়ার বিভিন্ন অংশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের অনুগামীদের সংখ্যাই পৃথিবীতে সর্বাধিক এবং এ-ধর্ম পরোক্ষভাবে অন্যান্য ধর্মের শিক্ষা ও অনুশাসনকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিতও করেছে।

একদা বৌদ্ধধর্মের অনেক কিছু এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করেছিল। খ্রীস্টধর্মে ও বৌদ্ধধর্মে প্রাধান্য এবং প্রভুত্ব নিয়ে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামও একসময়ে বড় কম ছিল না। খ্রীস্টধর্মের আদিযুগে নষ্টিক (Gnostics) প্রমুখ যে-সব সম্প্রদায়ের উদ্ভূত হয়েছিল, তাঁদের আচার-আচরণ, মতি-গতি বৌদ্ধদেরই অনুরূপ ছিল আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর বিচিত্র আবহাওয়ার মধ্যে রোমক আইনের অধীনে যে ধর্মগত সংমিশ্রণ সাধিত হয়েছিল–তারই দানে খ্রীস্টধর্মের উৎপত্তি হয়।

বৌদ্ধধর্মের রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক-তার ধর্ম এবং আচার-আচরণাদি অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণীয়। এবং বিপুলশক্তিসম্পন্ন একটি বিশ্ববিজয়ী ধর্মরূপে তার যে প্রথম আত্মপ্রকাশ–তার মাধুর্যও কম নয়।

আজকের ভাষণে আমি মূলতঃ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব এবং তার প্রসার কতকাংশে অনুধাবন করতে হলেও–সে মহান ধর্মগুরুর আবির্ভাবকালে ভারতবর্ষের অবস্থা কেমন ছিল-সে-বিষয়ে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সেদিনের ভারতবর্ষে এক বহু বিস্তৃত বিরাট ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সে ধর্মের সুসম্বদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ-বেদ। বেদসমূহ বাইবেলের মতো একটি গ্রন্থমাত্র ছিল না। পরন্তু নানা গ্রন্থের সমবায়ে বেদ ছিল একটি সাহিত্য-বিশেষ। অবশ্য বাইবেলও বিভিন্ন যুগের রচনার সমষ্টি, বিভিন্ন লেখকের হাতের সুষ্ট সম্পদ। কিন্তু বেদসংগ্রহ অতি বিশাল। আর তার সব গ্রন্থ পাওয়াই যায় না, এমনকি তাঁদের

সবগুলির নাম পর্যন্ত ভারতবর্ষেও কেউ অবগত নয়। কিন্তু যদি কোন প্রকারে সে-গ্রন্থের সবগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হতো, তবে এই প্রশস্ত কক্ষটিতেও তাদের স্থান সঙ্কুলান হতো না।

সে এক বিরাট–এক বিপুল সাহিত্য-সংগ্রহ। সেই মহান শাস্ত্রকার শ্রীভগবানের কাছ থেকেই এই সাহিত্য বংশ-পরম্পরায় আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। সেজন্য ভারতবর্ষে শাস্ত্রবিষয়ক ধারনা অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী ছিল, গোঁড়ামিতে পূর্ণ ছিল।

আপনার গ্রন্থপূজার গোঁড়ামি সম্পর্কে অভিযোগ করে থাকেন। কিন্তু এ-সম্পর্কে হিন্দুর মনোভাব জানতে পারলে আপনারা কি ভাববেন-কে জানে?

হিন্দু বিশ্বাস করে যে, বেদ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত জ্ঞান। বেদসহায়েই এই বিশ্বচরাচর সৃষ্ট হয়েছে এবং বেদে নিহিত বলেই তাঁদের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। একটি গাভী এই স্থূল জগতে বিরাজ করছে, কারণ 'গাভী' শব্দটি বেদে রয়েছে। একটি মানুষ এই পার্থিব জগতে বিদ্যমান, কারণ 'মানুষ' শব্দটি বেদমধ্যে উল্লিখিত আছে। এরই মধ্যে সেই মতবাদের জন্মসূত্র দেখা যায়-যেটি উত্তরকালে খ্রীস্টধর্মাবলম্বিগণ বর্ধিত করেছিলেন এবং এইভাবে প্রকাশ করেছিলেন-'সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিল শুধু শব্দ এবং শব্দ ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ছিল।' -এ তত্ত্ব ভারতবর্ষের প্রাচীন তত্ত্ব ; এ তত্ত্বের ভিত্তির উপরই শাস্ত্রের ভাবরাশি দণ্ডায়মান। অবশ্য এ-কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, শব্দ-মাত্রই ঐশী শক্তির আধার। বহির্বিশ্ব ভাবের মূর্তপ্রকাশস্বরূপ। সুতরাং প্রকাশমাত্রেই জাগতিক ক্ষেত্রে স্থূল প্রকাশ এবং শব্দমাত্রেই বেদ, আর সংস্কৃতই দেবভাষা। সেজন্য ভারতীয়দের মতে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য সকল ভাষাই নিম্নপর্যায়ের পশুকণ্ঠ-নিঃসৃত ভাষার মতো। আর সে-সব ভাষা-ভাষীরাই 'ম্লেচ্ছ' শব্দে অভিহিত। গ্রীকদের পরিভাষায় 'বর্বর' শব্দটি যেমন, এ 'ম্লেচ্ছ' শব্দটিও (সংস্কৃত) সেইরূপ।

বেদসমূহ কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়, দেবতামণ্ডলীর সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় তাঁরা বিদ্যমান। ভগবান অনন্ত, জ্ঞানও অনন্ত এবং সেই অনন্ত জ্ঞানসহায়েই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। ঐ গ্রন্থেই জগতের সবকিছু বিধৃত, তার বাইরে কিছু নেই। মানুষের যতকিছু নীতিজ্ঞান, ভালমন্দ বিচার-সবই ঐ গ্রন্থের অনুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ ঐশ্বরিক জ্ঞানের ঊর্ধ্বে মানুষ উঠতে পারে না-ভারতীয় গোঁড়ামির এই হলো মূলকথা।

বেদের শেষাংশ উচ্চতম আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ। আর প্রথমাংশ অপেক্ষাকৃত স্থূল।

বেদগ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেই 'এটি ভাল নয়, ওটি ভাল নয়' - এরূপ মন্তব্য আপনারা করে থাকেন। কিন্তু কেন? 'বহু অনভিপ্রেত এবং মন্দ অনুশাসন এর মধ্যে নিহিত আছে'। এইজন্য ? তা হয়তো আছে কিন্তু ওল্ড টেস্টামেন্টেও তো এ-জাতীয় ব্যাপার আছে। প্রাচীনর গ্রন্থমাত্রেই এমন বহু বিচিত্র মত, বহু উদ্ভট চিন্তার উল্লেখ আছে, যা আজকের দিনে আমরা পছন্দ করব না।

'এ মতবাদটি ভাল নয়', 'আমার নীতিবোধে এটি বাধে'।-

এ-জাতীয় উক্তির 'কারণ' সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করলে, অথবা কেন আপনার নীতিতে বাধে–এ-কথা জিজ্ঞাসা করলে, উত্তর আসে–'না, এর মধ্যে কোন প্রশ্ন বা যুক্তির অবকাশ নেই।' ..... এই যদি অবস্থা হয় তবে স্তব্ধ হও দূরে সরে থাক।

বেদের যে নির্দেশ, সেটি পালন করাই বিধি। বেদ-নিদিষ্ট ভাল-মন্দই শেষ কথা। সে-বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা মানুষের অধিকার-বর্হিভূত।

এখন বিপদ তো এইখানেই। বেদ-বিরোধী কোন উক্তির সমর্থনে কোন হিন্দুকে যদি কেউ বলে যে-'আমাদের বাইবেলে তো এ-কথা নেই।' তবে তম্মুহূর্তে উত্তর হবে-'ওঃ' তোমাদের বাইবেল ? ও তো সেদিনের একটি অতি-আধুনিক ইতিহাস। বেদ ভিন্ন আবার শাস্ত্র কোথায় ? গ্রন্থ কোথায় ? ভগবানই সর্বজ্ঞানের আকর। কাজেই পুনঃ পুনঃ একাধিক বা বেদের মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দেবেন, এটা সম্ভব নয়। বেদগ্রন্থের মধ্য দিয়েই তাঁর শিক্ষার প্রথম প্রকাশ। সে কি তবে ভুল? মিথ্যা ? উত্তরকালে উচ্চতর কোন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বেদ বা বাইবেল তিনি সৃষ্টি করেছিলেন-এমন ঘটনা কি সম্ভব ?

'বেদগ্রন্থের মতো প্রাচীন গ্রন্থ আর নেই। অন্য সকল গ্রন্থই বেদের অনুগামী, বেদের অনুকরণে রচিত।' আপনাদের কথা তাঁরা গ্রহণ করবেন না। আবার খ্রীস্টানগণও বাইবেল গ্রন্থটি দেখিয়ে বলবেন, ও-সকল উক্তি প্রতারণামাত্র। ভগবানের উক্তি অভ্রান্ত এবং তা একবার মাত্রই উচ্চারিত হয়ে থাকে।

এখন এ-সবই বিশেষভাবে চিন্তা করবার বিষয়। গোঁড়ামি অবশ্যই অতি বিষম বস্তু।

যদি কোন হিন্দুকে কোন সামাজিক সংস্কার-বিষয়ে আপনারা অনুরোধ

করেন, যদি বলেন, 'এরূপ করা সঙ্গত' অথবা,' 'এরূপ করা সঙ্গত নয়', তবে উত্তরে সে বলবে, 'এ-সব কি আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে নির্দিষ্ট হয়েছে ? যদি না হয়ে থাকে, তবে ও-সবের জন্য আমাদের মাথাব্যথা নেই। কোন পরিবর্তন করবার পক্ষাপাতী আমরা নই।' কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবে যে, আমাদের ব্যবস্থাই কল্যাণপ্রদ।

যদি বলা হয়,...'তোমাদের সমাজপ্রতিষ্ঠানগুলি উৎকৃষ্ট নয়।' তবে সঙ্গে সঙ্গে তারও উত্তর আসবে-'বটে ! তুমি সেই-কথা জানলে কিভাবে? তোমার অভিমতের ভিত্তিটি কি ? আমাদের বিশ্বাস, আমাদের সমাজ-সংস্থাসমূহ তোমাদের সমাজব্যবস্থার তুলনায় উন্নততর। অপেক্ষা করলে চার-পাঁচ শত বৎসরের মধ্যেই দেখতে পাবে যে, কালকে অতিক্রম করে আমরা দাঁড়িয়ে আছি আর তোমাদের মৃত্যু ঘটছে'... এ-ধরনের কথাই তারা বলবে।

এই হচ্ছে উৎকট গোঁড়ামি আর ভগবানের আর্শীবাদে সে মহাসঙ্কট-সমুদ্র আমি অতিক্রম করেছি।

এই গোঁড়ামি ভারতবর্ষে ছিল। কিন্তু গোঁড়ামি ভিন্ন আর কি ছিল ? ছিল-বিচ্ছিন্ন ভাব ও বিভাগ। সমগ্র সমাজটিই -আজকের মতো বহু জাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। আর সে-সব বিভাগ আজকের তুলনায় কঠোরতর ছিল।

আরও একটি ব্যাপার আছে লক্ষ্য করবার মতো। অধুনা নুতন নূতন জাতিগোষ্ঠী সৃস্টি করবার দিকে একটি প্রবণতা পাশ্চাত্যেও এসেছে।

আমি নিজে অবশ্য জাতির বাইরে। জাতিগত বন্ধন ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি না। সে বন্ধন আমি ছিন্ন করেছি। জাতির ভাল দিকও অবশ্য কিছু আছে, কিন্তু ভগবান করুন–আমি যেন জাতিবন্ধনে আবদ্ধ না হই। জাতি গোষ্ঠী শব্দে আমি কোন বস্তুটি বোঝাতে চাই–তা হয়তো আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন। কারণ মনুষ্যসমাজ অতি দ্রুত একে গ্রহণ করে থাকে। হিন্দুদের মধ্যে বৃত্তির উপরই জাতি নির্ভরশীল। প্রাচীনযুগে হিন্দুদের জীবনলক্ষ্য ছিল সুখ-শান্তিপূর্ণ সাবলীল এক জীবনধারা। কি উপায়ে জীবনের সবকিছু প্রাণময় হয়ে উঠতে পারে-এই প্রশ্ন। আর তার উত্তর–প্রতিযোগিতা কিন্তু বংশগত বৃত্তি প্রতিযোগিতা নষ্ট করে দেয়। তুমি কাষ্ঠশিল্পী? সূত্রধর? উত্তম। তোমার পুত্র সূত্রধর হবে।

তুমি? তুমি কর্মকার? কর্মকার-বৃত্তি তো একটি জাতিগত বৃত্তি–অতএব

তোমার পুত্রও কর্মকার হবে। ভারতবর্ষে এক বৃত্তির মধ্যে অন্য বৃত্তির কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। কাজেই নিরুপদ্রবে একটি বৃত্তি নিয়েই মানুষ জীবন ধারণ করে।

তুমি যুদ্ধ ব্যবসায়ী, যোদ্ধা? অথবা তুমি পুরোহিত? উত্তম। তোমার বৃত্তির ভিত্তিতে একটি জাতি গড়ে তোল। পৌরোহিত্য বংশানুক্রমিক। অন্যান্য বৃত্তিও তাই। আবার নিরঙ্কুশ উচ্চক্ষমতা বা উচ্চাধিকারের কথা যদি চিন্তা করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, তারও একটি বিশেষ দিক আছে। সে দিকটি হচ্ছে এই যে, কোন প্রতিযোগিতা সে বরদাস্ত করে না। তবে এরই ফলে এইজাতি-বিভাগের পরিণতিতেই–ভারতবর্ষ মহাকালের প্রভাব অতিক্রম করে বেঁচে রইল, আর অন্যান্য বহু জাতি বিলুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু অন্যভাবে এর একটি মন্দ দিকও আছে। এতে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ব্যাহত।

সূত্রধরের পুত্রকে কাঠের কাজই করতে হবে–তা সে পছন্দ করুক, আর নাই করুক। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই এ ব্যবস্থা ভারতীয় শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ছিল এবং সেই প্রাক-বৌদ্ধযুগের কথাই আমি এখন বলছি।

আধুনিক যুগের সমাজতন্ত্রবাদ এরই অনুকৃতি। এরও ফল হয়তো পরিণামে ভালই হবে, কিন্তু ক্ষতচিহ্ন একটা থেকে যাবে বই কি। আমার মতে স্বাধীনতাই মূলকথা। ...মুক্ত হও। দেহে মনে ও আত্মায় পূর্ণ মুক্তি, পূর্ণ বন্ধনহীন–এই আমার আজীবন কামনা। ব্যক্তিগতভাবে আমি স্বাধীনতার সঙ্গে কোন মন্দ কাজ করতেও রাজি আছি, কিন্তু পরাধীনভাবে কোন সৎকাজ করতেও রাজি নই।

যাই হোক, বর্তমানে যে-সব বস্তুর জন্য পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা চিৎকার করছে- ভারতের নরনারী বহু যুগ পূর্বেই তার অনুশীলন করেছে। ভূমি জাতীয় সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছে। দৃঢ়বদ্ধ জাতিবিভাগও ভারতবর্ষে ধিকৃত ছিল। ভারতের মানুষ মনে-প্রাণে সমাজতন্ত্রবাদী। কিন্তু এর উর্ধ্বে আর একটি সম্পদ ছিল ভারতবর্ষে ; সে সম্পদ ব্যক্তিত্বের। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধিনিষেধ আরোপের পরও তাঁরা প্রচন্ডভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিল। সবকিছুর জন্য অবশ্য তারা নীতি-নিয়ম প্রণয়ন করেছে। পান, আহার, নিদ্রা, মৃত্যু- সবই সেখানে নিয়মে বিধৃত। অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করবার মুহূর্ত থেকে রাত্রিতে নিদ্রিত হবার কাল পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি কর্ম শাস্ত্রীয় বিধানে নিয়মিত। নিয়ম, নিয়ম, নিয়ম! এ-কথা কি চিন্তা করা যায় যে, একটা জাতি এমনি নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে? আইন তো প্রাণহীন। যে দেশে আইন যত বেশি সে দেশের অবস্থা তত মন্দ! সেজন্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ-কামনায় আমরা পাহাড়ে

যাই, পর্বতে আত্মগোপন করি- যেখানে কোন আইন নেই, কোন সরকার নেই। যেখানে যত আইন, সেখানে তত পুলিশ–তত দুর্জনের প্রাধান্য। আর দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে এই বিধিনিয়মের কড়াকড়ি প্রচন্ড। যে মুহূর্তে একটি শিশুর জন্ম হলো, সেই মুহূর্তে সে প্রথমে বর্ণের দাস হলো, তারপর হলো জাতির। দাসত্বশৃঙ্খলে সে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে গেল। তার প্রত্যেকটি কাজ, তার আহার-বিহার, ওঠাবসা–সবই নিয়ন্ত্রিত হবে আইনে, নিয়মে।

আহারকালে গ্রাসে গ্রাসে তাকে প্রার্থনা করতে হবে, জল পান করতেও তাই। দিনের পর দিন–জীবনের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সর্বক্ষণ ও সর্বমুহূর্তে এমনি নিয়মাধীন হয়েই তাকে থাকতে হবে। ভাবতেও আশ্চর্য বোধ হয়। অব্যাহত এই প্রণালী অনন্তকাল ধরে চলে আসছে।

কিন্তু তাঁরা চিন্তাশীল লোক ছিলেন- সন্দেহ নেই। তাঁরা জানতেন যে, এমন নিয়মাধীনতায় প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ হয় না, সেজন্য যথার্থ মুক্তিলাভের একটি ঋজুপথও তাঁরা উন্মুক্ত রেখেছিলেন। মোটের উপর বিধান এই ছিল যে, শুধু জাগতিক ক্ষেত্রে এবং সাংসারিক জীবনেই নিয়মাদি প্রযুক্ত হবে; কিন্তু যে মুহূর্তে কেউ কাঞ্চনাসক্তি ত্যাগ করবে, জাগতিক সুখ বিসর্জন দেবে, তম্মুহূর্তে সে পূর্ণভাবে স্বাধীন হয়ে যাবে। কোন বিধিনিষেধ আর তার উপর প্রযুক্ত হবে না। এদের নাম সন্ন্যাসী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁরা অতীতে কিংবা বর্তমানে–কোন কালেই কোন সঙ্ঘের অন্তর্ভূক্ত হননি। তাঁরা এক অনাসক্ত ও মুক্ত মানবগোষ্ঠী–পুরুষ ও নারী উভয়েই তাঁদের মধ্যে আছেন। তাঁরা কখনো বিবাহ করেন না, বিত্ত আহরণ করেন না। তাঁরা কোন নিয়মের অধীন নন, এমনকি বেদবিধি মেনে চলতেও তাঁরা বাধ্য নন। বেদশীর্ষে তাঁদের স্থান। আমাদের সমাজ-সংস্কার ঠিক বিপরীত বিন্দুতে যেন তাঁরা দণ্ডায়মান। জাতিগত বিধিনিষেধে তাঁরা আবদ্ধ থাকেন না। তাঁদের নিয়মিত করবার মতো কোন শক্তিই বিধিনিষেধের নেই। তাদের সীমিত গণ্ডিকে অতিক্রম করেই সন্ন্যাসীর জীবন। শুধু দুইটি নিয়ম তাঁদের পক্ষে অবশ্য পালনীয়। তাঁরা চিরনিঃসম্বল থাকবেন, চিরকুমার থাকবেন। অর্থ তাঁদের থাকবে না, বিবাহ তাঁরা করবেন না। এই অবস্থায় সমাজের কোন নিয়ম বা অনুশাসন তাঁদের উপর প্রযুক্ত হবে না। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা বিবাহ করবেন অথবা অর্থোপার্জন করবেন- সেই মুহূর্তে সমাজের প্রত্যেকটি নিয়ম তাঁদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে, অবশ্য পালনীয় হবে। এই সন্ন্যাসীরাই ছিলেন জাতির জীবন্ত দেবতা এবং এঁদের মধ্যে থেকেই শতকরা নিরানব্বই জন মহাপুরুষ উদ্ভূত হয়েছিলেন।

যে কোন দেশেই হোক, আত্মার পূর্ণ মহিমার উপলব্ধি ব্যক্তিত্বের চরমোৎকর্ষের উপর নির্ভর করে এবং সে উৎকর্ষ সমাজ-বন্ধনের মধ্যে উপলব্ধি করা যায় না। বিকাশোন্মুখ ব্যক্তিত্ব সমাজ-বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সেই বন্ধনকে সে ছিন্ন করে ফেলতে চায়। যদি কোন সমাজ বাধাস্বরূপ হয়, তবে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সে নিজেকে বিকশিত করতে চেষ্টা করে।

এই দুই বিপরীত শক্তির মাঝখানেই একটি সহজ পন্থা শেষ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, যদি তুমি সমাজের বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, যদি সংসার ত্যাগ কর, তবে তুমি যদৃচ্ছা প্রচার করতে পার, শিক্ষা দিত পার। দূর থেকে আমরা শুধু তোমাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব।

ফলে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নর ও নারীর উদ্ভব তখন সম্ভব হয়েছিল এবং তাঁরাই সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। এমন কি সেই মুণ্ডিত মস্তক গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসী উপস্থিত হলে রাজাও নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকতে সাহসী হতেন না। তাঁকে আসন ত্যাগ করে দাঁড়াতে হতো। এ যেমন একদিকে, অন্যদিকে হয়তো আধঘন্টার মধ্যেই সেই সন্ন্যাসী এক অতি দরিদ্রের জীর্ণ কুটিরের সম্মুখে গিয়ে ভিক্ষার্থী হয়ে দণ্ডায়মান হতেন এবং এক-টুকরা রুটি ভিক্ষা -স্বরূপ গ্রহণ করে প্রস্থান করতেন।

সমাজের সর্বস্তরের লোকের সঙ্গেই তাঁদের মেলামেশা ছিল। আজ হয়তো এক দরিদ্রের পর্ণকুটিরে সন্ন্যাসীর রাত্রিযাপন, আবার পরদিন রাজপ্রাসাদের মনোরম শয্যায় তাঁর সুখনিদ্রা। একদিন রাজগৃহে স্বর্ণপাত্রে তাঁর ভোজন, অন্যদিন সম্পূর্ণ অনাহারে এবং বৃক্ষতলে দিনযাপন। এই ছিল সন্ন্যাসীর জীবন। সমাজ এঁদের অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত। কখনো কখনো নিজের ব্যক্তিত্ব প্রচার করতে গিয়ে কোন সন্ন্যাসী হয়তো উৎকট ধরনের কিছু করেও বসত। কিন্তু বৃহত্তর সমাজ তাতে ক্ষুব্ধ হতো না, কিছু মনেই করত না। সে শুধু দেখতে চাইত–সন্ন্যাসীর মূল দুটি ধর্ম–পবিত্রতা ও ত্যাগব্রত অব্যাহত রয়েছে কি না।

তাঁদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত প্রবল ছিল বলে তাঁরা নূতন চিন্তা এবং তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। নূতন দেশে তাঁরা যেতেন। পুরাতনের গণ্ডি অতিক্রম করে নূতনের সন্ধান তাঁদের করতেই হতো। নিয়মাবদ্ধ সমাজে সকলে চাইত পুরাতন গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে–একই ধরনের চিন্তা করতে। কিন্তু মানুষের নিগূঢ় প্রকৃতি এ ধরনের সংস্কারবদ্ধতা বরদাস্ত করে না। নির্বুদ্ধিতার চেয়ে মানুষের সদ্বুদ্ধি অধিক শক্তিশালী। দুর্বলতার চেয়ে

সবলতাই অধিক ক্রিয়াশীল ; অসদ্বস্তু থেকে সদ্বস্তু সবলতর। সেইহেতু গন্ডিবদ্ধ মানুষের একঘেয়েমি বজায় রাখবার চেষ্টা সফল হয়নি। যদি হতো, যদি তারা সকল মানুষকে একই ধরনের চিন্তাধারায় গ্রথিত করতে সমর্থ হতো, তবে আমরা জড়ত্ব প্রাপ্ত হতাম। চিন্তা জগতে আমাদের মৃত্যু হতো।

বস্তুতঃ এখানে এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, যার কোন জীবনী-শক্তি ছিল না, যার সদস্যগণ নিয়মের লৌহশৃঙ্খল আবদ্ধ ছিল। পরস্পরকে সাহায্য করতে তারা বাধ্য ছিল। নিয়ম-বন্ধন এত কঠোর এবং নির্মম ছিল যে, কোন কাজই নিয়ম-বহির্ভূত হবার উপায় ছিল না। কিভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে হবে, কিভাবে হাতমুখ প্রক্ষালিত হবে, এক কথায়, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি–সবই নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল।

আর, এ-সব গণ্ডিবদ্ধতার বাইরে ছিল সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ব্যক্তি স্বাধীনতা আর সেই শক্তিশালী সন্ন্যাসীদের মধ্য থেকেই নিত্যনূতন সম্প্রদায়ে উদ্ভব হচ্ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এঁদের স্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে। একটি নারীর এরূপ কাহিনী আছে, তিনি বয়স্কা ছিলেন। তাঁর ধরন-ধারণ একটু অস্বাভাবিক রকমের ছিল। কিন্তু নিত্যনূতন চিন্তার অবতারণা তিনি করতে পারতেন। তাঁকে অবশ্য অনেকে অনেক সময় সমালোচনা করত। আবার তাঁকে সমীহও করত, নীরবে তাঁর নির্দেশ পালনও করত। এ-ধরনের নরনারী প্রাচীনযুগে একাধিক ছিলেন।

আবার সেই নিয়মবদ্ধ সমাজে ক্ষমতা ছিল পুরোহিত-শ্রেণীর হস্তে। সমাজের স্তরবিন্যাসে-বর্ণশ্রেষ্ঠ যাঁরা, তাঁদের মধ্য থেকেই পুরোহিত হতেন এবং তাঁদের যে কাজ ছিল–তাতে 'পুরোহিত' শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দে তাঁদের অভিহিত করা য়ায় বলেও আমার মনে হয় না। অবশ্য এদেশে যে-অর্থে 'পুরোহিত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, আমাদের দেশে সে অর্থে ব্যবহৃত হতো না পুরোহিতগণ ধর্ম বা দর্শন শিক্ষা দিতেন না। সমাজে নির্দিষ্ট বিধিবিধানসমূহ যথাযথ পালিত হচ্ছে কি না, সেটি দেখা এবং সেবিষয়ে সাহায্য করাই তাঁদের কাজ ছিল। বিবাহ দেওয়া, শ্রাদ্ধ-শান্তিতে উপাসনা করাও তাঁদের কাজ ছিল।

ফলকথা, সমাজের ক্রিয়াকর্মে, উৎসবানুষ্ঠানে পুরোহিতের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। সমাজব্যবস্থায় গার্হস্থ্য ছিল শ্রেষ্ঠ আশ্রম। প্রত্যেককেই বিবাহ করতে হবে–এই ছিল অনুশাসন। বিবাহ ভিন্ন কোন ধর্মানুষ্ঠানে অধিকার জন্মাত না। অবিবাহিত পুরুষ বা নারী পূর্ণ মানুষ বলে বিবেচিতই হতো না ! অবিবাহিত পুরোহিতেরও ক্রিয়াকর্মে অধিকার থাকত না। অবিবাহিত ব্যক্তি সমাজে বেমানান বলেই বিবেচিত হতো।

এ-কালে পুরোহিতের ক্ষমতা খুব বেড়েছিল। যাঁরা সমাজপতি, আইন-প্রণয়ন যাঁদের কাজ, তাঁদের নীতিই এমন ছিল, যাতে পুরোহিতগণ সমাজে যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। এদেশেরই মতো একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাঁদের মধ্যেও ছিল, যার প্রভাবে পুরোহিতবর্গের হাতে অধিক অর্থ যেতে পারত না। উদ্দেশ্য ছিল যে, পুরোহিতদের, সামাজিক মর্যাদাই বড় হোক, আর্থিক মর্যাদা নয়।

এ-কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পুরোহিতগণ সব দেশেই মর্যাদা ও সম্মান পেয়ে থাকেন। ভারতবর্ষে আবার সে মর্যাদা এত বেশি ছিল যে, অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণও আজন্ম সামাজিক মর্যাদায় রাজা অপেক্ষা উন্নত। সমাজব্যবস্থা তাঁকে চিরদারিদ্র্যে নিষ্পেষিত করবে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁকে সম্মান দেবে প্রচুর। তাঁদের জন্য বাধানিষেধ ছিল সহস্র ধরনের। আবার যার বর্ণ যত উচ্চ, তার ভোগ-সুখের পথে বিধিনিষেধ ছিল তত কঠিন। তাছাড়া, উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের আহারাদির ব্যবস্থা তত কঠোর হবে এবং আহার্য-বস্তুনিচয়ের সংখ্যা তত সীমাবদ্ধ হবে। জীবনধারণের জন্য যে-সকল বৃত্তি তাঁরা অবলম্বন করতে পারবেন, সেগুলিও অতি অল্প কয়েকটি বৃত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এই ছিল ব্যবস্থা। আপনাদের কাছে তাঁদের জীবন একটি অন্তহীন কঠোরতার নিদর্শন-বলে মনে হবে। আহারে, বিহারে, পানে, গ্রহণে-সর্বক্ষেত্রেই অফুরন্ত বিধিনিষেধ।

আবার সে-সব বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করলে যে-সকল শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, তাও নিম্নতর বর্ণের থেকে ব্রাহ্মণের পক্ষে বহুগুণ নির্মম ছিল। একজন নিম্ন বর্ণের লোকের জন্য মিথ্যাভাষণের দণ্ড যদি হতো এক টাকা, তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে-তাঁর উচ্চতর জ্ঞানের জন্য দণ্ড হতো শতগুণ।

প্রারম্ভিক অবস্থায় অবশ্য ব্যবস্থাটি অতি সুন্দর ছিল। কিন্তু উত্তরকালে এমন একটি সময় উপস্থিত হলো, যখন এই পুরোহিত-সম্প্রদায় প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হলেন এবং তখনই তাঁরা এই মূল কথাটি বিস্মৃত হলেন যে, তাঁরা এমন একটি মানবগোষ্ঠী, যাঁরা গভীরভাবে অধ্যয়ন করবেন, চিন্তা করবেন-এবং সে সুযোগ দানের জন্যই সমাজ তাঁদের আহার, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতির যাবতীয় দায়িত্ব বহন করবে। কিন্তু কালক্রমে তাঁদের ভোগ-পিপাসা জাগ্রত হলো এবং অর্থ লাভের জন্যও তাঁরা হাত বাড়াতে লাগলেন। আপনাদের পরিভায়ায় যাদের 'অর্থগৃধ্নু' 'money-grabbers' বলে-তাঁরা তাই হয়ে উঠলেন এবং অন্য সব কিছু বিস্মৃত হলেন।

ব্রাহ্মণের পর দ্বিতীয় জাতি হলো ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ এবং রাজ্যশাসন-এই ছিল তাঁদের কাজ। প্রকৃত ক্ষমতা এঁদেরই হস্তে ন্যস্ত ছিল। আর তাঁদের মধ্য থেকেই আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের উদ্ভব হয়েছে, ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে নয়। সেও এক বিচিত্র ব্যাপার। অবতারপুরুষ বলে আমাদের সমাজে যাঁরা পূজিত তাঁদের সকলেই ক্ষাত্রকুলোদ্ভব, একটিও ব্যতিক্রম নেই। মহামনীষী শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ঐ ক্ষত্রিয়কুল থেকে। রামচন্দ্র ও ক্ষাত্রকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমাদের দেশের খ্যাতনামা দার্শনিকগণ প্রথমে রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছেন এবং রাজসিংহাসন থেকেই ত্যাগব্রতী দার্শনিকদের উদ্ভব হয়েছে। আবার ঐ রাজসিংহাসন থেকেই নিয়ত এ-আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে–'ত্যাগ কর, ত্যাগ কর'।

যুদ্ধব্যবসায়ীরা দেশের শাসনকর্তা, তাঁরাই দার্শনিক, তাঁরাই উপনিষদের প্রবক্তা। চিন্তায়, ধীশক্তিতে পুরোহিতবর্গ অপেক্ষা এঁরা উন্নত ছিলেন। ক্ষমতাও এঁদেরই অধিক ছিল, কারণ এঁরাই ছিলেন রাজা। অথচ আধিপত্য করতেন পুরোহিতগণ এবং ভীতিপ্রদর্শনের চেষ্টাও তাঁরা করতেন। ফলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়-এই দুই বর্ণের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল।

আরও একটি ব্যাপার আছে। আপনাদের মধ্যে যাঁরা আমার প্রথম ভাষণটিতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা অবগত আছেন যে, ভারতবর্ষে দুইটি বৃহৎ মানবগোষ্ঠী বিদ্যমান–একটি আর্য, অপরটি অনার্য। আর্যদের মধ্যে আবার তিনটি বর্ণ আছে–ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। এই তিন বর্ণের বাহিরে যে জনসমষ্টি, সেটি সমগ্রভাবে 'শূদ্র' নামে অভিহিত, আর্যগোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্তই তারা নয়। বহু বিদেশী পর্যটক বাহির থেকে এসে এই শূদ্রদেরই দেখেছে। তাঁরাই ছিল দেশের আদিবাসী। যাই হোক, কালক্রমে অনার্যগোষ্ঠীর বিপুল জনসমষ্টি এবং আরও যারা নানাজাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হয়ে অনার্য জাতির দেহে মিশে গেল, তার সবাই ক্রমশঃ সভ্য হয়ে উঠতে লাগল এবং আর্যদের অনুরূপ অধিকার-লাভের জন্য প্রয়াসী হলো।

তাঁরা শিক্ষালাভের জন্য আর্যদের মতো বিদ্যায়তনে প্রবেশ করতে চাইল; উপবীত ধারণ করতে চাইল; ক্রিয়া, কর্ম ও উৎসবের অধিকার চাইল। ধর্ম এবং রাজনীতিতেও সমান অধিকার দাবি করল।

অবশ্য পুরোহিতগণ স্বভাবতই এ দাবির বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন

করলেন। পৃথিবীর সর্বদেশেই পুরোহিতবর্গের এই রীতি। তাঁরা স্বতই অত্যন্ত গোঁড়া হয়ে থাকেন। আর যতদিন পৌরোহিত্য একটি বৃত্তি থাকবে, ততদিন এ গোঁড়ামি থাকবেই। কারণ তাঁদের নিজ স্বার্থের খাতিরেই এ গোঁড়ামির প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং অনার্যগোষ্ঠীর সে দাবি এবং বিক্ষোভ দমন করবার জন্য পুরোহিতগণ সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। আবার আর্যগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রবল ধর্মবিক্ষোভ দেখা দিল এবং সে বিক্ষোভ পরিচালনা করলেন ঐ ক্ষত্রিয়গণ।

আরও এক সনাতনপন্থী সম্প্রদায় ছিল ভারতবর্ষে–সে জৈন সম্প্রদায়। সে সম্প্রদায় অত্যন্ত গোঁড়াও বটে, প্রাচীনও বটে। হিন্দুশাস্ত্র বেদের প্রামাণিকতাই এরা অস্বীকার করেছিল। তাঁরা নিজেরা কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থ করেছিল এবং একথাও ঘোষণা করেছিল যে, তাঁদের প্রণীত গ্রন্থাদিই যর্থাথ বেদ। আর যেগুলি বেদ-নামে প্রচলিত–সেগুলি সর্বসাধারণকে প্রতারিত করবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণরা রচনা করেছিল। অবশ্য তাদের কর্মপন্থাও ঐ একই ধরনের ছিল।

এ-কথা মনে রাখতে হবে যে– নিজ ধর্মগ্রন্থ বিষয়ে হিন্দুদের যে যুক্তি, সে যুক্তি নিরসন করা সহজসাধ্য নয় এবং সেজন্য জৈনদের দাবিও হিন্দুদেরই অনুরূপ ছিল। অর্থাৎ তাঁদের ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমেই সৃষ্টির প্রকাশ হয়েছে। আর সর্বসাধারণে প্রচলিত যে ভাষা, শাস্ত্রগ্রন্থগুলিও সেই ভাষাতেই রচিত।

তখনই সংস্কৃত আর কথ্যভাষা ছিল না। তার সঙ্গে তৎকালীন কথ্যভাষার সম্পর্ক অনেকটা সেই রকম হয়ে উঠেছিল, যেমন সম্পর্ক দেখা যায়– বর্তমান ইতালীয় ভাষার সঙ্গে প্রাচীন লাটিন ভাষার। জৈনধর্মাবলম্বিগণ পালিভাষায় নিজ শাস্ত্রগ্রন্থাদি রচনা করেছিল সংস্কৃত ভাষায় নয়। কারণ তাঁরা বলত সংস্কৃত আর সজীব ভাষা নয়, ওটি মৃতভাষায় পর্যায়ভুক্ত।

তাদের আচার-পদ্ধতিতেও তারা স্বতন্ত্র ছিল।

বস্তুতঃ হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র এই বেদ এক বিশাল শাস্ত্র-সংগ্রহ। এর কতকাংশ একেবারে স্থূল ও অসার, অপরাংশ আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পূর্ণ– এ-অংশ থেকেই ধর্মজ্ঞান লাভ হতে পারে। আর এ–সব সম্প্রদায়ের সকলেই বেদের ঐ অংশটুকুই প্রচার করে বলে দাবি করে থাকে।

প্রাচীন-বেদে আবার তিনটি স্তরবিভাগ দেখা যায়। প্রথমে কর্ম, দ্বিতীয়তঃ উপাসনা এবং তৃতীয়তঃ জ্ঞান। কর্ম এবং জ্ঞান দ্বারা নিজেকে পরিশুদ্ধ করলেই ভগবান মানুষের অন্তরে প্রতিভাত হবেন। তিনি যে নিরন্তর অন্তরেই অধিষ্ঠিত–এ-উপলব্ধি ও তখন তার হবে। অন্তরের বিশুদ্ধতার ফলেই

এ–উপলব্ধি সম্ভব হয়। শুধু কর্ম এবং উপাসনার দ্বারাই মন পবিত্র হতে পারে। সেই একমাত্র পন্থা। মুক্তি তখন করায়ত্ত হয়। অতএব কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান–এই তিনটি সোপান–বিশেষ। যে সম্প্রদায়ের কথা বলছি, তাঁদের বিচারে কর্মের অর্থই অপরের উপকার-সাধন। এ-কথার তাৎপর্য অবশ্যই একটি আছে। কারণ ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে কর্মের অর্থই ছিল বিস্তৃত উৎসবানুষ্ঠান–গো, মহিষ,ছাগ প্রভৃতি পশুবলি অথবা অন্যবিধ প্রাণীদের যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি-প্রদান।

এখন জৈনধর্মাবলম্বিগণ এ-সব কর্মের বিরুদ্ধে কঠিন মত প্রকাশ করত। তাঁরা বলত যে, এ-সব কর্ম কর্মই নয়। অন্যকে আঘাত দেওয়া কখনো সৎকার্য হতে পারে না। পরন্তু এ-সব কর্ম এ-কথাই প্রমাণ করে যে, ব্রাহ্মণদের বেদ মিথ্যা ; সেটি পুরোহিতদের তৈরি একটি পুস্তকমাত্র। কারণ কোন মহৎ গ্রন্থ মানুষকে প্রাণিহত্যা করতে নির্দেশ দেবে-এটা অসম্ভব, এটা অবিশ্বাস্য। অতএব প্রাণিহত্যা, পশুবলি প্রভৃতির যে-সব নিদের্শ বেদে লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেগুলি ব্রাহ্মণদেরই রচনা। কারণ সেগুলি তাদেরই স্বার্থের অনুকূল, তাঁদেরই অর্থাগমের সহায়ক। কাজেই সে-সবই পুরোহিতদের কৌশলমাত্র।

জৈনদের আর একটি মত হচ্ছে এই যে, ভগবানের কোন অস্তিত্ব নেই। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য, আর সেই সূত্রে ধনসম্পদ সংগ্রহ করবার জন্য পুরোহিতদেরই সৃষ্টি-এই ভগবান। সবটাই এক বিরাট ধাপ্পা। অস্তিত্ব আছে প্রকৃতির, অস্তিত্ব আছে আত্মার। ব্যস, আর কিছু নেই, ভগবান অবাস্তব-অস্তিত্বহীন।

এ-জীবনটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে আত্মা জড়িয়ে পড়েছে। দেহ যেন একটি বহির্বাসরূপে তাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। সুতরাং সৎকর্মের অনুষ্ঠান করে যাও। সেটিই পথ।

এদের মতবাদ থেকেই জড়বস্তুর হেয়ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছিল। এরাই জগতে কৃচ্ছ্রসাধনার প্রথম শিক্ষক। অপরিশুদ্ধতা থেকেই যদি দেহের জন্ম হয়, তবে দেহটি কোন উৎকৃষ্ট বস্তু নয়। যদি কেউ কিছুকাল এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে–উত্তম, সেটি তার শাস্তিস্বরূপ হয়ে গেল। যদি অকস্মাৎ দেয়ালে মাথাটি ঠুকে যায়, তবে সেটিও একটি আকাঙ্ক্ষিত শাস্তি মাত্র।

একদা ফ্রান্সিস্কান সম্প্রদায়ের কতিপয় নেতৃস্থানীয় পুরুষ–সেন্ট ফ্রান্সিস তাঁদের অন্যতম–কোন ব্যক্তি–বিশেষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাত্রা করেছিলেন। সেন্ট ফ্রান্সিসের সঙ্গে একজন সহযাত্রী পথ চলছিলেন। কথা হচ্ছিল এই নিয়ে যে, যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁরা যাচ্ছেন, তিনি তাঁদের

অভ্যর্থনা করবেন কি না, তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন কি না। সহযাত্রীটি বললেন, খুব সম্ভব তিনি আমাদের অভ্যর্থনা করবেন না–প্রত্যাখ্যান করবেন। তদুত্তরে সেন্ট ফ্রান্সিস বলেছিলেন, "তাঁর প্রত্যাখ্যানই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, বন্ধু ! যদি দ্বারে আমাদের করাঘাত শুনে তিনি বেরিয়ে আসেন এবং আমাদের দূর করে তাড়িয়ে দেন, তবে সেটাও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে না ; অথবা তিনি যদি আমাদের হাত-পা বেঁধে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করেন, তাহলে সেটিও পর্যাপ্ত হলো বলে আমি মনে করব না ; তবে যদি আমাদের হাত-পা সব দৃঢ়ভাবে বেঁধে, বেত্রাঘাতে প্রতি লোমকূপ থেকে রক্তমোক্ষণ করিয়ে তিনি আমাদের ঘরের বাইরে বরফের মধ্যে ফেলে রাখেন, তবে সেটাই আমাদের উদ্দেশ্যলাভের পক্ষে পর্যাপ্ত হতে পারে।"

এমনি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার একটি মনোভাব সে-যুগে বিদ্যমান ছিল।

বস্তুতঃ জৈনরাই ছিল কৃচ্ছ্রসাধনার পথিকৃৎ। তবে সেই সঙ্গে তাঁরা কিছু কিছু মহৎকার্যও সম্পন্ন করেছিল। তাঁদের কথা ছিল–কাউকে আঘাত করো না, দুঃখ দিও না, যথাশক্তি অপরের উপকার সাধন কর। এই কর্ম, এই নীতি ও সদাচার-এ ছাড়া আর যা কিছু সবই ব্রাহ্মণদের হাতে গড়া বাজে জিনিস ; সেগুলি বর্জন কর।

এই মতবাদের ভিত্তিতেই তারা কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং এটিকেই নানাভাবে পূর্বাপর তাঁরা বিস্তৃত করেছিল। সে এক বিচিত্র আদর্শ। শুধু অ-বৈরী ও পরোপকারের ভিত্তিতে সকল নৈতিক আদর্শকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া-একটি অভিনব আদর্শ বইকি !

বুদ্ধদেবের অন্ততঃ পাচঁশত বৎসর পূর্বেকার এই সম্প্রদায়। আবার বুদ্ধদেবও খ্রীস্টের জন্মের সাড়ে–পাচঁশত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। এরা সমগ্র প্রাণীজগৎকে পাচঁটি ভাগে বিভক্ত করেছিল। তাদের মধ্যে সর্ব নিম্নস্তরের যে জীব, তার মাত্র একটি ইন্দ্রিয় বর্তমান, সেটি স্পর্শেন্দ্রিয়। তার উপরের স্তরে রয়েছে স্পর্শ ও আস্বাদন-ইন্দ্রিয়। তারও উপরে–স্পর্শ–স্বাদ এবং শ্রবণেন্দ্রিয়। চতুর্থ স্তরে আবার-পূর্বের তিনটির সঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয় যুক্ত হয়। আর সর্বশেষ স্তরে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সবই বর্তমান থাকে।

এক বা দুই ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট যে-সব প্রাণী-তাঁরা চর্মচক্ষে দৃশ্যমান নয়। তাঁরা জলমধ্যে অবস্থান করে। এদের–এই অতি–নিম্নপর্যায়ের প্রাণীদের হত্যা করা অতি ভয়াবহ কার্য।

এ-যুগে প্রাণিজগতের এ-সকল তত্ত্ব অতি অল্পদিন আগে মাত্র জানা গেছে। তৎপূর্বে এ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। জৈনদের মত এই ছিল যে, সর্ব নিম্নস্তরে প্রাণীদের এক স্পর্শানুভূতি ভিন্ন আর কিছু নেই। তার উপরের স্তরের প্রাণীরাও অদৃশ্য। জৈনরা জানত যে, এ-সব প্রাণী শুধু জলেই বাস করে এবং জল ফুটালে এরা মারা যায়। কাজেই জৈনসন্ন্যাসীরা তৃষ্ণায় মরে গেলেও নিজেরা জল ফুটিয়ে পান করতেন না। কিন্তু ভিক্ষার্থী হয়ে কোন গৃহে গেলে গৃহস্থ যদি জল পান করতে দিত, তবে সে জল তাঁরা গ্রহণ করতেন। কারণ সেক্ষেত্রে প্রাণিহত্যার দায় ছিল গৃহস্থের, আর জল পানের সুবিধাটুকু মাত্র ছিল তাঁদের নিজেদের।

অহিংসার ধারণাটিকে এরা ক্রমশঃ এক হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করিয়েছিল। যেমন-স্নানের সময় শরীর মার্জনা করলে অসংখ্য অদৃশ্য জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায় মনে করে এরা স্নানই করত না। এরা নিজেরা মরতে প্রস্তুত ছিল। কারণ মৃত্যু এঁদের কাছে এক অতি তুচ্ছ পরিণতি ছিল। আর অপর কোন প্রাণীকে হত্যা করে বেঁচে থাকতেও এরা প্রস্তুত ছিল না।

এদেরই সমসাময়িক কালে আরও নানা কৃচ্ছ্রসাধন-পরায়ণ সম্প্রদায় ছিল এবং এই কৃচ্ছ্রসাধনার কালেই পুরোহিত এবং রাজন্যবর্গের মধ্যে রেষারেষি ও রাজনৈতিক বিদ্বেষ দানা বেঁধে উঠেছিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নানা বিক্ষব্ধ সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হয়েছিল।

আরও কঠিন সমস্যা ছিল জনসাধারণকে নিয়ে। কারণ এ-কালেই জনসাধারণ সর্ববিষয়ে আর্যদের সম-অধিকার দাবি করছিল। প্রকৃতির নিত্য-প্রবহমান স্রোতস্বিনীর তীরে দাঁড়িয়ে জল পানের অধিকার থেকে চিরবঞ্চিত হওয়া তাদের পক্ষে যেন ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

এই মহাসন্ধিক্ষণেই সেই বিরাট পুরুষ বুদ্ধদেবের জন্ম হয়েছিল। তাঁর জীবন এবং চরিতকথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। নানা অলৌকিক ঘটনা বা কাহিনীতে মণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও-যা মহাপুরুষ মাত্রেরই জীবনে হয়ে থাকে-বুদ্ধদেব জগতের ইতিহাস-স্বীকৃত মহাপুরুষগণের অন্যতম। বস্তুত এদিক থেকে মাত্র দুজন মহাপুরুষের নামই উল্লেখ করা যেতে পারে, যাঁদের সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র উভয়েই একমত, একজন সুপ্রাচীন বুদ্ধদেব, অপরজন হজরত মুহম্মদ। সুতরাং এঁদের উভয়ের সম্বন্ধেই আমরা সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। অন্যান্য মহাপুরুষ-সম্বন্ধে তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের উক্তি আর বিশেষ কিছু আমাদের হাতে নেই।

আমাদের শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে আপনারা জানেন। হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে অবতার-পুরুষরূপে তিনি পূজিত। তাঁর কাহিনী বহুলাংশে আখ্যান-চরিত মাত্র।

শুধু তাঁর অনুগামী শিষ্যগণই তাঁর জীবনের অধিকাংশ কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এর ফলে, অনেক সময় একই ব্যক্তির মধ্যে যেন একাধিক ব্যক্তি মিশ্রিত হয়ে পড়েছে। বস্তুতঃ বহু অবতারপুরুষ সম্বন্ধেই আমরা খুব বেশি কিছু জানি না। কিন্তু বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। কারণ শত্রু ও মিত্র-উভয়পক্ষই তাঁর কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আরও একটি কথা: মহাপুরুষদের জীবনের সঙ্গে যত কাহিনী, যত অলৌকিক গল্প ও উপাখ্যান জড়িত হয়, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাহ্য কাহিনীসমূহের অন্তরালে প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব সত্তা, একটি আভ্যন্তরীণ স্বকীয়তা থাকে। কিন্তু এ মহাপুরুষদের জীবনে কোন স্তরে, কোন সময়ে স্বকীয় প্রয়োজনে কোন প্রয়াস দেখা যায় না। এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে এই যে, যখনই কোন মহাপুরুষকে অবলম্বন করে কোন আখ্যায়িকা রচিত হয়, তখনই সেই মহাপুরুষের মাহাত্ম্য ও মহিমায় সেটি অনুরঞ্জিত হয়ে থাকে। বুদ্ধদেবের বেলায়ও তাই হয়েছিল সত্য ; কিন্তু তাঁর জীবন বা চরিত্র নিয়ে যত উপাখ্যান রচিত হয়েছে, তার কোনটিতে কোথাও কোন অসদাচরণ বা নীচকার্যের ইঙ্গিত নেই। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁর প্রশংসাই করেছে।

জন্মলগ্ন থেকেই বুদ্ধ এত পবিত্র ছিলেন, এত নির্মল ছিলেন যে যে-ই তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করেছিল, সে-ই আনুষ্ঠানিক ধর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং পরিত্রাণ লাভ করেছিল। ফলে দেবতাগণ এক সভা আহ্বান করে নিজেদের অসহায় অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। কারণ যাগযজ্ঞের উপরই ছিল দেবতাদের নির্ভর, যজ্ঞভাগই ছিল দেবতাদের প্রাপ্য। আর বুদ্ধের প্রভাবে সেই যাগযজ্ঞই বিলুপ্ত হয়েছিল। ফলে একদিকে দেবতাদের আহার যেমন বন্ধ হয়েছিল, অন্যদিকে তাঁদের প্রভাবও তেমনি বিলুপ্ত হয়েছিল। সুতরাং দেবতাগণ তখন এ-কথাই ঘোষণা করেছিলেন, 'যেমন করেই হোক, বুদ্ধকে পতিত করতে হবে। তাছাড়া আমাদের আর কোন গতি নেই। তাঁর পবিত্রতা আমাদের পক্ষে দুঃসহ।'

এ-সিদ্ধান্তের পরই দেবতামণ্ডলী বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে সৌম্য, তোমার কাছে আমাদের একটি নিবেদন আছে। আমরা একটি মহাযজ্ঞের সঙ্কল্প করেছি। সেজন্য একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করতে হবে। কিন্তু সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করেও এমন একটি পবিত্র স্থান আমরা বের করতে পারলাম না, যেখানে সে অগ্নি প্রজ্বলিত করা যায়। তবে এখন সে-

স্থানের সন্ধান আমরা পেয়েছি। তুমি যদি নিজ বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে শয়ন কর, তবে তোমারই বুকের উপর আমরা অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করতে পারি।'

বুদ্ধ বললেন, 'তাই হবে। আপনারা যজ্ঞ আরম্ভ করুন।' দেবগণ বুদ্ধের বুকের উপর বিশাল অগ্নি প্রজ্বলিত করলেন এবং ভাবলেন যে, সে অগ্নির উত্তাপে বুদ্ধের মৃত্যু হবে। বুদ্ধ মরলেন না। তখন দেবতাগণ একান্ত হতাশ হলেন এবং তাঁদের হতাশার ভাব সর্বত্র প্রকাশ করতে লাগলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ পুনঃ বুদ্ধদেবকে কঠিন আঘাত করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হলো না। বুদ্ধকে হত্যা করা গেল না।

তখন সে অগ্নিকুণ্ডের নিচ থেকে এই প্রশ্ন শব্দিত হলো : 'আপনারা এ বৃথা শ্রম করছেন কেন? আপনাদের উদ্দেশ্য কী?' উত্তর হলো, 'তোমার পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে যে-ই দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সে-ই শুদ্ধ হয়ে যায় আর কেউ আমাদের উপাসনা করে না, সেজন্য তোমার ধ্বংস আমরা কামনা করছি।'

তদুত্তরে বুদ্ধ বললেন, 'তাহলে আপনাদের পরিশ্রম বৃথা। পবিত্রতা কখনো ধ্বংস হয় না।'

এই কাহিনী বুদ্ধের বিরুদ্ধবাদীদের রচনা। অথচ এর মধ্যেও বুদ্ধচরিত্রের প্রতিকূলে শুধু এই দোষটুকুই আরোপিত হয়েছে যে, তিনি এক অদ্ভুত ধরনের পবিত্রতা প্রচার করেছিলেন। আর কিছু নয়। বুদ্ধের মতবাদ সম্বন্ধে আপনাদের অনেকে কিছু কিছু অবগত আছেন।

বর্তমানকালের যে-সব চিন্তাশীল মনীষী অজ্ঞেয়বাদী বলে পরিচিত, তাঁদের কাছে বুদ্ধের মতবাদের বিশেষ একটি আবেদন আছে। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মহান প্রবক্তা ছিলেন বুদ্ধদেব। তাঁর কথা এই ছিল : 'আর্য-অনার্য-নির্বিশেষে, জাতি-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে-প্রত্যেক মানুষের অধিকার রয়েছে ধর্মের উপর, অধিকার রয়েছে ঈশ্বরের উপর, স্বাধীনতার উপর। অতএব সে-অধিকারের ক্ষেত্রে সকলকেই আমি আহ্বান করি।'

কিন্তু এ-ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কঠোর অজ্ঞেয়বাদী। বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হতেই তিনি সর্বদা উপদেশ দিতেন। একদা পাঁচজন তরুণ-সকলেই ব্রাহ্মণ-একটি প্রশ্নের উপর তর্ক-বিতর্ক করতে করতে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল। 'সত্যলাভের পথ কি?'-এই ছিল তাঁদের প্রশ্ন। তাদের একজন বলল, 'আমাদের মতে–এইটি সত্যের পথ। আমার পূর্বপুরুষগণ এ-কথাই প্রচার করেছেন।

আর একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'আমি কিন্তু অন্যরূপ শিক্ষা লাভ করেছি, এবং আমার বিশ্বাস আমাদের নির্দিষ্ট পথটিই সত্যলাভের একমাত্র পথ।'

'হে আচার্য-এখন এর মধ্যে কোনটি ঠিক, তাই আমাদের জিজ্ঞাসা।'

বুদ্ধদেব তখন তাঁদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে এই কথা বলেছিলেন, 'তোমাদের আত্মগোষ্ঠী সবাই সত্যলাভের জন্য এক একটি পথ নির্দেশ করেছেন। উত্তম! কিন্তু তুমি নিজে কি ঈশ্বর দর্শন করেছ? অথবা তোমাদের পিতা কিংবা পিতামহ কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন ?'

'না, তাঁরা কেউ ঈশ্বর দর্শন করেননি, তাঁদের পিতা-পিতামহও ঈশ্বর দর্শন করেননি।'

'আচ্ছা, তোমাদের আচার্যদের মধ্যে কেউ কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন ?'

'না, তাঁরাও ঈশ্বর দর্শন করেননি।'

সকলের মুখেই এক উত্তর। সকলেরই এক কথা। কেউ তারা ঈশ্বর দর্শন করেনি।

তখন বুদ্ধদেব সেই পঞ্চ-তরুণকে একটি উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন; বলেছিলেন; দেখ, একবার এক গ্রামে হঠাৎ কোথা থেকে একটি যুবক উপস্থিত হয়েছিল। সে কখনো কাঁদছে, কখনো বিলাপ করছে, কখনো চিৎকার করছে। বলছে, 'আহা আমি তাকে অত্যন্ত ভালবাসি, নিবিড়ভাবে ভালবাসি।' তার চিৎকারে গ্রামবাসীরা বেরিয়ে এল। তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে তুমি ভালবাস? কে সে?' 'তা আমি জানি না।' কোথায় থাকে সে কন্যা? তার চেহারাই বা কেমন?' 'হায়, আমি সে-সব কিছুই জানি না। কোন সংবাদ রাখি না। শুধু এইটুকু জানি যে, আমি তাকে অত্যন্ত ভালবাসি।'

এখন এই যুবকটি সম্বন্ধে তোমাদের অভিমত কি-তা আমি জানতে চাই।

তরুণগণ তখন সবাই একযোগে বলে উঠল, 'কেন মশাই, ও তো একটি আস্ত নির্বোধ! যাকে সে জানে না, চেনে না, যাকে কখনো দেখেনি-এমন একটি অবাস্তব মেয়ের জন্য যে চিৎকার করে বেড়াচ্ছে, তাকে একান্ত বেকুব ভিন্ন আর কি বলা যাবে?'

তখন বুদ্ধ বললেন, 'তাহলে তোমরাও কি অনেকাংশে তাই নও! তোমরা নিজেরাই স্বীকার করছ যে, তোমরা কিংবা তোমাদের পিতা, পিতামহ কেউ কখনো ঈশ্বর দর্শন করেনি। ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বংশপরম্পরায়

তোমাদের কারও নেই। অথচ সেই ঈশ্বর নিয়েই তোমরা তর্ক করছ, পরস্পরের টুটি ছিড়ে ফেলতে চাইছ। একি পাগলামি নয় ?'

তখন তরুণগণ বিব্রত হয়ে বুদ্ধকে প্রশ্ন করল, 'তাহলে এখন আমাদের কি করা উচিত–তাই বলুন।'বুদ্ধদেব বললেন, 'বেশ, তবে শ্রবণ কর। আচ্ছা তোমাদের পূর্বপুরুষগণ কখনো কি এমন কথা বলেছেন যে, ভগবান কোপন-স্বভাব, ভগবান অসৎ?' 'আজ্ঞে না, তেমন কথা তাঁরা কখনো বলেননি। তিনি চির-সৎ, চির-পবিত্র-এই তাঁরা বলেছেন।'

'তাহলে হে তরুণগণ–তোমরা যদি কায়মনোবাক্যে সৎ হও, সর্বভাবে পবিত্র হও, তবেই ভগবানের সান্নিধ্যে পৌছতে পারবে। তর্ক-বিতর্ক করে বা পরস্পরকে আক্রমণ করে ভগবান লাভ হয় না। অতএব আমার নির্দেশ এই যে-পবিত্র হও, সৎ হও। সর্বান্তঃকরণে অপরকে ভালবাস। ভগবানলাভের এই চিরন্তন পথ, অন্য পথ কিছু নাই।'

বুদ্ধের জন্মকালেই প্রাণিহত্যা না করবার এবং জীবে দয়া প্রদর্শন করবার নীতি আদর্শরূপে গৃহীত ছিল–এ কথা আমরা আলোচনা করেছি, সেক্ষেত্রে বুদ্ধদেব নূতন কিছু করেননি ; কিন্তু তিনি নূতন যেটি করেছিলেন, সেটি হচ্ছে-জাতিভেদপ্রথা উচ্ছেদের জন্য একটি প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত। তাছাড়া আরও একটি অভিনব কাজ বুদ্ধদেব সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি তাঁর চল্লিশজন শিষ্যকে পৃথিবীর নানা স্থানে প্রেরণ করেছিলেন। এই নির্দেশ দিয়ে : 'বৎসগণ, তোমরা সকল দেশের সকল মানুষের সঙ্গেই উদার ভাব নিয়ে মিলিত হবে, জাতিধর্মনির্বিশেষে মিলিত হবে, এবং সকলের কল্যাণ-সাধনকল্পে মহাবাণী প্রচার করবে।'

অবশ্য এজন্য হিন্দুরা সৌভাগ্রক্রমে তাঁকে নির্যাতিত করেনি। তিনি পূর্ণবয়সে দেহত্যাগ করেছিলেন। বরাবর তিনি অতি কঠোর জীবনযাপন করেছেন। কোন দুর্বলতা কখনো তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর বহু মতবাদে আমি বিশ্বাস করি না। না, সত্যি বিশ্বাস করি না। আমি বরং বিশ্বাস করি যে, প্রাচীন হিন্দুদের বেদান্তবাদ অনেক বেশি চিন্তাপূর্ণ ; বেদান্তের জীবনদর্শন অপূর্ব। বুদ্ধের কর্মপদ্ধতি যে আমি অপছন্দ করি, তা অবশ্য নয়। তবে তাঁর যে বৈশিষ্ট্য আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে, সেটি হচ্ছে তাঁর দৃঢ়তা,তাঁর মহত্ত্ব এবং তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি। তাঁর মস্তিষ্কে কোন জটিলতা ছিল না। যখন বিশ্বের সকল ঐশ্বর্য তাঁর পাদমূলে এসেছিল, তখনও তাঁর মধ্যে তিলমাত্র পরিবর্তন হয়নি ; তখনও তাঁর মধ্যে এই মনোভাব সম্পূর্ণ অব্যাহত

ছিল– 'আমি আর দশজনেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ'।

আপনারা জানেন, হিন্দুরা মানুষ-পূজা করতে ভালবাসে, সেদিকে তাদের আগ্রহ ঐকান্তিক। যদি আপনারা কিছু দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন, তবে দেখতে পাবেন, আমাকেও বহু লোক পূজা করবে ! যদি হিন্দুদের মধ্যে কেউ কোন ধর্মপ্রচার করে, তবে জীবিতকালেই তাঁকে তারা পূজা করতে শুরু করে। ফল–কথা, কাউকে পূজা করবার আগ্রহ এবং প্রবণতা তাদের চিরন্তন। অথচ তাদেরই মধ্যে বাস করেও বিশ্ববিখ্যাত বুদ্ধদেব আজীবন এ ঘোষণাই করে গেছেন যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষমাত্র। এ-ছাড়া অন্য কোন উক্তি তাঁর কণ্ঠ থেকে তাঁর কোন ভক্ত কখনো বের করতে পারেনি।

তাঁর অন্তিম বাক্যগুলি চিরদিন আমার অন্তরে একটি অব্যক্ত স্পন্দন জাগ্রত করেছে। তিনি তখন বৃদ্ধ, রুগ্ন, মৃত্যুপথযাত্রী ; ঠিক সে-সময়ে একজন অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ ব্যক্তি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল ; সে গলিতমাংসভোজী। হিন্দুরা সেই জাতের কাউকে লোকালয়েই প্রবেশ করতে দেয়না। সেই শ্রেণীর একটি লোক সশিষ্য বুদ্ধদেবকে তাঁর গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করেছিল। সে দীন দরিদ্র ব্যক্তিটির নাম চুন্দ। সে তার সাধ্যমত, যুক্তিবিবেচনামত সেই মহান আচার্যকে আপ্যায়িত করতে চেয়েছিল। তাই প্রচুর শূকর-মাংস এবং অন্ন প্রস্তুত করে বুদ্ধদেব ও তাঁর শিষ্যগণকে সে পরিবেশন করল। বুদ্ধদেব একবার সেই আহার্যগুলি তাকিয়ে দেখলেন। শিষ্যেরা সবাই ইতস্ততঃ করছিল- তারা সেই ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করবে কিনা। বুদ্ধদেব তখন তাদের বললেন, 'এ আহার্য তোমরা কেউ গ্রহণ করো না, তাতে তোমাদের ক্ষতি হবে।' কিন্তু তিনি নিজে শান্তভাবে আসনে বসে সেই আহার্য গ্রহণ করলেন তিনি সমদর্শী তিনি আচার্য ; অতএব তিনি চুন্দ-প্রদত্ত খাদ্যও গ্রহণ করবেন-এমনকি শূকরের মাংসও খাবেন ! তাই তিনি খেলেন, স্থিরভাবে সেই আহার্য গ্রহণ করলেন।

তিনি তখন মরণাপন্নই ছিলেন। এখন মৃত্যু একেবারে আসন্ন উপলব্ধি করে বললেন, 'ঐ বৃক্ষের নিচে আমার জন্য শয্যা করে দেওয়া হোক। আমার মনে হচ্ছে–আমার প্রয়াণের সময় উপস্থিত হয়েছে।'

তারপর সেই বৃক্ষমূলেই তিনি শয্যাগ্রহণ করলেন এবং সেখানেই দেহত্যাগ করেন, আর সেই শয্যা ছেড়ে উঠতে পারেননি। ঐ বৃক্ষতলে শুয়ে তিনি প্রথমেই জনৈক শিষ্যকে বলেছিলেন, 'চুন্দের কাছে গিয়ে তাকে জানিয়ে এস, তার মতো উপকারী বন্ধু আমার আর কেউ নেই, কারণ তাঁর দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করেই আমি নির্বাণ লাভ করতে চলেছি।'

এর পরও কতক লোক তাঁর কাছে উপদেশলাভের জন্য এসেছিল। একজন শিষ্য তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছিল, 'প্রভুর খুব কাছে তোমরা যেও না। তিনি এখন মহাসমাধিতে নিমগ্ন হতে চলেছেন।' কিন্তু সে-কথা শোনামাত্র বুদ্ধদেব বলে উঠলেন, 'না, না, ওদের আসতে দাও।' আবার কয়েকজন লোক-এল, আবার শিষ্যেরা তাদের বাধা দিতে গেল ; কিন্তু আবার বুদ্ধদেব তাদের নিকটে আহ্বান করলেন। তারপর তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য আনন্দকে ডেকে বুদ্ধদেব বললেন, 'বৎস আনন্দ ! আমি চলে যাচ্ছি, সেজন্য শোক করো না। আমার জন্য চিন্তা করো না। মনুষ্যজীবনে মৃত্যু অবধারিত। তোমরা নিজেদের মুক্তির জন্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা কর। তোমরা প্রত্যেকেই সর্বাংশে আমারই মতো। আমি তোমাদেরই একজন ছাড়া আর কিছু নই। অশেষ তপস্যায় আমি আমার জীবন গঠিত করেছি, সুতরাং তোমরাও অক্লান্ত চেষ্টা দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করতে পার।'

বুদ্ধের শেষ অক্ষয় বাণী ছিল এইরূপ : 'কোন শাস্ত্রগ্রন্থের প্রামাণ্য, তা সে যত প্রাচীন গ্রন্থই হোক, মেনে নিও না। শুধু পূর্বপুরুষগণের উক্তি বলে কোন কথায় বিশ্বাস করো না, অথবা আর দশজন লোক বিশ্বাস করে বলেও কোন মতবাদ গ্রহণ করো না। প্রতিটি জিনিস পরীক্ষা কর, যাচাই কর, তারপর বিশ্বাস কর। আর যদি কোন কিছু বহুজনের হিতকর হবে বলে মনে কর, তবে সকলের মধ্যে সেটি বিতরণ কর।' -এই শেষ বাণী উচ্চারণ করেই বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেছিলেন।

এই মহতী প্রজ্ঞাবাণী অনুধাবনযোগ্য। তিনি দেবতা নন, দানব নন, দেবদূতও নন। না, সে-সব কিছুই তিনি নন। তিনি শুধু একজন দৃঢ়চিত্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি-যাঁর মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষই নিখুঁত, পরিপুষ্ট এবং জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সতেজ ও ক্রিয়াশীল। মোহ নেই, ভ্রান্তি নেই-এই বুদ্ধের স্বরূপ। তাঁর অনেক মতবাদের সঙ্গেই আমি একমত নই, আপনাদের অনেকেও হয়তো একমত হবেন না। কিন্তু আমি ভাবি–আহা, তাঁর মহাশক্তির এককণাও যদি আমার থাকত ! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান দার্শনিক তিনি। প্রবল ব্রাহ্মণ্যশক্তির অত্যাচারের কাছে কখনো তিনি মাথা নত করেননি। না, কখনো না। সর্বত্র সহজ ও ঋজু-এই তাঁর প্রকৃতি ছিল। দুঃখীর দুঃখে তিনি দুঃখী, তাঁদের সাহায্যে তিনি মুক্তহস্ত। আবার সঙ্গীত-সভায় তিনি মহাসঙ্গীতজ্ঞ। শক্তিমানের মধ্যে তিনি মহাশক্তিমান। কিন্তু সর্বত্রই সেই এক প্রাজ্ঞ মনীষী, সেই সমর্থ শক্তিমান পুরুষ।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বে তাঁর মতবাদের সবকিছু আমার বোধগম্য নয়। আপনারা

জানেন–হিন্দুমতে মানুষের মধ্যে যে আত্মা বিরাজ করেন, সেই আত্মাকে তিনি স্বীকার করেননি। আর আমরা-হিন্দুরা এ-কথা বিশ্বাস করি যে, মানুষের মধ্যে শাশ্বত একটি পদার্থ আছে–যেটি অপরিবর্তনীয়, যেটি অনন্তকালস্থায়ী। সেই পদার্থই আত্মা ; তাঁর আদি নেই, অন্ত নেই-সে-ই ব্রহ্ম। কিন্তু বুদ্ধদেব এই আত্মা, ব্রহ্ম-দুই-ই অস্বীকার করেছেন। তিনি বলতেন, কোন বস্তুর চিরস্থায়িত্বের কোন প্রমাণ নেই।... সবই নিত্যপরিবর্তনের সমষ্টিমাত্র। নিত্যপরিবর্তশীল যে চিন্তাস্রোত-তারই সমষ্টিকে 'মন' বলে। একটি ঘূর্ণায়মান মশাল যেন এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করছে, কিন্তু ঐ 'অলাতচক্রটি'মায়া। অথবা একটি নদীর উপমা গ্রহণ করা যেতে পারে-একটি নদী যেমন অবিরাম প্রবাহে গতিশীল, প্রতি মুহূর্তে তার মধ্য নূতন জলরাশি আসছে এবং চলে যাচ্ছে–জীবনও ঠিক তেমনি ; দেহ, মনও তেমনি।

কিন্তু আমি তাঁর মতবাদ ঠিক বুঝতে পারি না।হিন্দুরা কখনো বুঝতে পারেনি। তবে তাঁর মতবাদের নিগূঢ় উদ্দেশ্যটি আমি বুঝতে পারি। আহা, সেটি একটি মহান উদ্দেশ্য–বিরাট উদ্দেশ্য ! বুদ্ধদেব বলতেন, জগতে স্বার্থপরতাই প্রচণ্ড অভিশাপ। আমরা স্বার্থপর, তাই আমরা অভিশপ্ত বটে। স্বার্থপরতাই কু-মতলব পরিহার করা কর্তব্য। একটি ঘটনাপ্রবাহেরই মতো জীবন রয়ে চলেছে। নদীপ্রবাহের সঙ্গেই তুলনা হতে পারে। ঈশ্বর নয়, আত্মা নয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নিয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও। সৎকাজের জন্যই সৎকাজের অনুষ্ঠান কর–শাস্তির ভয়ে নয়, কোন আকাঙ্ক্ষিত লোকে যাবার উদ্দেশ্য নিয়েও নয়।

সুবুদ্ধি নিয়ে দাঁড়াও, মতলব ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াও। সৎকাজ সৎ বলেই আমি তার অনুষ্ঠান করব, অন্য কোন কারণে নয়–এই হবে উদ্দেশ্য। কি অদ্ভুত, কি বিচিত্র এই মতবাদ ! আমি তাঁর দার্শনিক তত্ত্বগুলির সঙ্গে কোন সময়েই একমত নই, এ-কথা পূর্বেই বলেছি : কিন্তু তাঁর নৈতিক প্রভাব আমাকে যেন উৎসাহিত করে তোলে। আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে প্রশ্ন করুন, দেখুন তাঁর মতো নির্ভীকতা নিয়ে, শক্তি নিয়ে-এক ঘন্টাও নিজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে দাড়াঁতে পারেন কি না। আমি তো পাচঁ মিনিটেই যেন ভয় পেয়ে যাই, একটি অবলম্বন যেন আমার কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠি। তাঁর যে প্রচণ্ড মহাশক্তি, তাঁর কাছাকাছি যাওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তেমন শক্তি-প্রকাশ জগৎ ইতঃপূর্বে আর কখনো প্রত্যক্ষ করেনি । আমি নিজে তো এরূপ শক্তি এ-পর্যন্ত কোথাও দেখিনি।

বস্তুতঃ আমরা তো ধর্মভীরু। নিজেকে বাঁচাতে আমরা সর্বদা সচেষ্ট, আর

সেটি হলেই আমরা তৃপ্ত হয়ে থাকি। প্রচণ্ড ভীতি, নিগূঢ় স্বার্থপরতা সর্বদা আমাদের মধ্যে কাজ করছে ; তারই ফলে আমাদের ভীরুতার শেষ নেই, ভয়ের অবধি নেই। অথচ এর মধ্যে দাঁড়িয়েই তাঁর এই ঘোষণা–'সৎ বলেই সৎকার্য অনুষ্ঠান কর। কোন প্রশ্ন উত্থাপন করো না, সে-সবই নিরর্থক। গল্পে উপাখ্যানে, সংস্কার-সহায়ে মানুষকে সৎকার্যে প্রণোদিত করা হয়ে থাকে। তথাপি সুযোগ পেলেই সে অসৎকার্যে লিপ্ত হয়। শুধু সৎকর্মের জন্যই যে ব্যক্তি সৎ কর্মের অনুষ্ঠান করে থাকে, সে-ই যথার্থ মহৎ। কার্য-মাধ্যমে তার চরিত্রেরই যর্থাথ পরিচয় পাওয়া যায়।'

একদা বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'মৃত্যুর পর মানুষের কী অবশিষ্ট থাকে ?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'সবই থাকে।' কিন্তু মানুষের মধ্যে অক্ষয় পদার্থ কোন্‌টি, সেটি তার চরিত্র–তার দেহ নয়, আত্মা নয়, অন্য কিছুই নয়। আর সেই চরিত্রই কালজয়ী হয়ে জীবিত থাকে। যাঁরা চলে গেছেন, তাঁরা তাঁদের চরিত্ররূপ মহাসম্পদই শুধু রেখে গেছেন, রেখে গেছেন আমাদের জন্য, সমগ্র মানবজাতির জন্য। আর কালে কালে সেই চরিত্র–প্রভাব কাজ করে চলেছে।

বুদ্ধের কথাই বলুন আর যীশুখ্রীস্টের কথাই বলুন... এ-জগৎ তাঁদের চরিত্র-মহিমায় উদ্ভাসিত ! মহাশক্তি-সমন্বিত এই মতবাদ। যা হোক, আসুন আমরা আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই , কারণ সে-প্রসঙ্গে এখনও আমরা পৌছাইনি। কাজেই আজ সন্ধ্যাই আরও দু-চারটি কথা আমায় কলতে হবে। ... বুদ্ধদেব-সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে-তাঁর কর্মপন্থা, তাঁর সংগঠন। আজ গির্জা-সম্বন্ধে, ধর্মসংস্থা-সম্বন্ধে আপনাদের যে মত ও ধারণা গড়ে উঠেছে–সে-ও তাঁরই চরিত্র থেকে। তিনি মামুলি ধরনের ধর্মসংস্থা পরিত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু নিজ সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গকে একত্র করে নূতন একটি সঙ্ঘ গঠন করেছিলেন। সেই সঙ্ঘে-যীশুখ্রীস্টের জন্মের সাড়ে পাচঁ-শ বছরেরও পূর্বে ভোটপত্র-সহায়ে মতামত দেবার প্রথা পর্যন্ত গৃহীত হয়েছিল এবং তাঁর সংগঠনও সর্বাংশে নিখুঁত ছিল। পূর্বতন ধর্মসংস্থার বাইরে-এই নূতন ধর্মসঙ্ঘ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছিল এবং ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে প্রভূত সেবামূলক কাজ করেছিল।

এর তিন-শ বছর পরে এবং যীশুখ্রীস্টের জন্মের দু-শ বছর পূর্বে মহা সম্রাট অশোকের আবির্ভাব হয়। পাশ্চাত্য দেশের ঐতিহাসিকগণ তাঁকে 'দেবোপম সম্রাট' বলে আখ্যাত করেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধের মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালে সমগ্র পৃথিবীতে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর পিতামহ ছিলেন আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক এবং সে-সময় থেকেই

ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্রীসের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

অধুনা প্রায় প্রত্যহই মধ্য এশিয়ায় কোন শিলালিপি বা ঐ-জাতীয় কিছু আবিস্কৃত হচ্ছে। ভারতবর্ষ তো বুদ্ধ বা অশোকের কথা ভুলেই গিয়েছিল। অথচ এখানে স্তম্ভগাত্রে বা শিলাখণ্ডে প্রাচীন হরফে বহু বাণী উৎকলিত ছিল, কিন্তু সেগুলির পাঠোদ্ধার করতে কেই সক্ষম ছিল না। ... প্রাচীন মোগল সম্রাটদের কেউ কেউ লক্ষ মুদ্রা ঘোষণা করেও সেগুলির পাঠোদ্দারে সক্ষম হননি।

কিন্তু বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সে-সব লিপির পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। পালি-ভাষায় সে-সব বাণী লিখিত।

প্রথম শিলালিপিটি এইরূপ :

অতঃপর যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং করুণ দুঃখকাহিনী বিস্তারিতভাবে উৎকলিত হয়েছে। এর পরই অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। শিলালিপিতে লিখেছিলেন : 'অতঃপর, আমার বংশধরগণের মধ্যে কেউ যেন অন্য কোন জাতিকে যুদ্ধে জয় করে যশোলাভের প্রয়াসী না হয়। যদি তারা যশস্বী হতে চায়, তবে অন্য জাতিকে সাহায্য করেই যেন তাঁরা যশ অর্জন করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাঁরা শিক্ষক ও আচার্য-বিভিন্ন দেশে যেন তাঁদের প্রেরণ করা হয়। তরবারির সহায়তায় যে যশ অর্জিত হয়, সেটা যশই নয়।'

এর পরই দেখা যায়–কিভাবে অশোক বিভিন্ন দেশে, এমনকি সুদূর আলেকজান্দ্রিয়ায় পর্যন্ত ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেছেন। আর বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে ঐ-সব অঞ্চলের সবর্ত্র নানা-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল–থেরাপুত্ত, এসিনি প্রভৃতি নামে যাদের খ্যাতি। এ-সব সম্প্রদায় কঠোর নিরামিষাশী।

মহামতি সম্রাট অশোক চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন মানুষের জন্য তো বটেই, পশুর জন্যও। নানা শিলালিপিতে এই-সব চিকিৎসালয় স্থাপনের নির্দেশ রয়েছে-দেখা যায়। যখন কোন গৃহপালিত পশু বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য হয়ে যাবে এবং তার মনিব দারিদ্র্যবশতঃ আর সেটিকে প্রতিপালন করতে সক্ষম হবে না, তখন তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে হবে, দয়া করে হত্যা করা হবে না। সে-সব চিকিৎসালয় জনসাধারণের অর্থেই পরিচালিত হতো।

এই ভাবে বৌদ্ধধর্ম রাজনীতি-ক্ষেত্রেও অসাধারণ প্রভাব ও ক্ষমতা বিস্তার করেছিল। কালক্রমে অবশ্য ধর্মপ্রচারকদের নানা অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে সে ধর্ম বিপর্যস্ত হয়েছিল। তবে তাঁদের কৃতিত্বের পরিচায়ক হিসাবে এ-কথা অবশ্য

স্বীকার করতে হবে যে, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তারা কখনো তরবারির সাহায্য গ্রহণ করেনি। আর সেই সঙ্গে এ-কথাও স্বীকার করতে হবে যে, এক বৌদ্ধধর্ম ভিন্ন জগতের আর কোন ধর্মই রক্তপাত না করে এক পা অগ্রসর হতে সক্ষম হয়নি। মাত্র মস্তিষ্কের শক্তি দিয়ে হাজার হাজার নরনারীকে ধর্মান্তর গ্রহণ করানো–অপর কোন ধর্মের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। না, কোথাও হয়নি, কোন যুগে হয়নি।..

বৌদ্ধধর্মে তিনটি জিনিস আছে। স্বয়ং বুদ্ধ,তাঁর ধর্ম ও তাঁর সঙ্ঘ। প্রথমে সেই ধর্ম অত্যন্ত সরল ছিল, অনাড়ম্বর ছিল। তাঁর মৃত্যুকালে তদীয় শিষ্যগণ প্রশ্ন করেছিলেন–'প্রভু' আপনার সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি ?"

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে নিয়ে তোমাদের কিছুই করণীয় নেই। যদি ইচ্ছা হয়, আমার চিতাভস্মের উপর একটি মাটির স্তূপ নির্মাণ করো। অথবা তাও করবার আবশ্যকতা নেই।' কিন্তু কালক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হলো বিশাল মন্দির স্তূপাদি বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন-রূপে নির্মিত হলো। বৌদ্ধরাই মূর্তিপূজা প্রচলিত করল অথচ তার পূর্বে মূতিপূজার বিষয় মানুষের জানাই ছিল না, বুদ্ধের নানা অবস্থার মূর্তি, ভোগ-নিবেদন, উপাসনা–সবই এসে গেল।

সঙ্ঘের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ–সবের জটিলতাও বর্ধিত হতে লাগল। ক্রমে বৌদ্ধ মঠগুলি প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী হলো; আর পতনের বীজও উপ্ত হলো সেই সঙ্গে। সন্ন্যাস যদি অল্পসংখ্যক যোগ্য অধিকারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সেটি ভাল, কিন্তু যখন সেই সন্ন্যাস এমনভাবে প্রচারিত হতে থাকে যে, যে–কোন পুরুষ বা নারী সামান্য আগ্রহ বা অনুপ্রেরণাবশেই সমাজ ও সংসার ত্যাগ করে সেটি গ্রহণ করতে শুরু করে, তখনই বিপদ; যখন দেখা গেল সারা ভারতর্বষ জুড়ে অনেক মঠ বা আশ্রম গড়ে উঠেছে এবং এক-একটিতে শত সহস্র সন্ন্যাসী বাস করছে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ হাজার পর্যন্ত ভিক্ষু একই মঠ-বাড়িতে বাস করছে–বিরাট বিশাল সব পাকা মঠ বা আশ্রমের বাড়ি, অবশ্য জ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপেই সেগুলি পরিচালিত, তখনই যর্থাথ বিপদের কাল–কারণ জাতীয় জীবনস্রোত তখনই ব্যাহত হয়। সৎ গৃহীর অভাবে সৎ পুত্রকন্যা আর সমাজে তখন যথেষ্ট সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করত না। সবল ও শক্তিমানগণ চলে গেল সমাজের বাইরে , আর দুর্বলের সংখ্যাধিক্য ঘটল সমাজে। ফলে শক্তি ও বীর্যের অভাবেই জাতি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেল।

বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ

(২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ ষোড়শ দিবসের অধিবেশনে বক্তৃতা)

হিন্দুধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত–কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ; সন্ন্যাসীরাই জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করিয়া থাকেন ; ইহাতে জাতিভেদ নাই। ভারতে উচ্চতম বর্ণের মানুষও সন্ন্যাসী হইতে পারে, নিম্নতম বর্ণের মানুষও সন্ন্যাসী হইতে পারে, তখন উভয় জাতিই সমান। ধর্মে জাতিভেদ নাই ; জাতিভেদ কেবল সামাজিক ব্যবস্থা। শাক্যমুনি স্বয়ং সন্ন্যাসী ছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয় এত উদার ছিল যে, লুকানো বেদের মধ্য হইতে সত্যকে বাহির করিয়া তিনি সেগুলি সমগ্র পৃথিবীর লোকের মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন–ইহাই তাঁহার গৌরব। পৃথিবীতে ধর্মপ্রচারের তিনিই প্রথম প্রবর্তক ; শুধু তাই নয়, ধর্মান্তরিত-করণের ভাব তাঁহারই মনে প্রথম উদিত হইয়াছে।

সকলের প্রতি–বিশেষতঃ অজ্ঞান ও দরিদ্রগণের প্রতি অদ্ভুত সহানুভূতিতেই তাঁহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার কয়েকজন শিষ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে সময়ে বুদ্ধ শিক্ষা দিতেছিলেন, সে সময়ে সংস্কৃত আর ভারতের কথা ভাষা ছিল না। ইহা সে-সময়ে পণ্ডিতদের পুস্তকেই দেখা যাইত। বুদ্ধদেবের কোন কোন ব্রাহ্মণ শিষ্য তাঁহার উপদেশগুলি সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে চান, তিনি কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, 'আমি দরিদ্রের জন্য-জনসাধারণের জন্য আসিয়াছি, আমি জনসাধারণের ভাষাতেই কথা বলিব, আজ পর্যন্ত তাঁহার অধিকাংশ উপদেশ সেই সময়কার চলিত ভাষাতেই লিপিবদ্ধ। দর্শনশাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যা যত উচ্চ আসনই গ্রহণ করুক, যতদিন জগতে মৃত্যু বলিয়া ব্যাপারটি থাকিবে, যতদিন মানবহৃদয়ে দুর্বলতা বলিয়া কিছু থাকিবে, যতদিন চরম দুর্বলতায় মানুষের মর্মস্থল হইতে রোদনধ্বনি উত্থিত হইবে, ততদিন ঈশ্বরে বিশ্বাসও থাকিবে।

দর্শনশাস্ত্রের দিক দিয়া সেই লোকগুরু বুদ্ধের শিষ্যগণ বেদরূপ সনাতন শৈলের অভিমুখে সবেগে পতিত হইলেন কিন্তু তাহাকে চূর্ণ করিতে পারিলেন না। অপর দিকে যে সনাতন ঈশ্বরকে নরনারী সকলে সাদরে ধরিয়া থাকে, তাঁহাকে সমগ্র জাতির নিকট হইতে অপসৃত করিলেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই হইয়াছিল। বর্তমানকালে বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতে এমন একজনও নাই, যিনি নিজেকে বৌদ্ধ বলেন।

কিন্তু এইসঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মও কোন কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সেই সমাজ-সংস্কারের জন্য আগ্রহ, সকলের প্রতি সেই অপূর্ব সহানুভূতি ও দয়া, সর্বসাধারণের ভিতর বৌদ্ধধর্ম যে ব্যাপক পরিবর্তনের ভাব প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, তাহা ভারতীয় সমাজকে এতদূর উন্নত ও মহান করিয়াছিল যে, তদানীন্তন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া জনৈক গ্রীক ঐতিহাসিককে বলিতে হইয়াছে : কোন হিন্দু মিথ্যা বলে বা কোন হিন্দুনারী অসতী–এ-কথা শোনা যায় না।

সভামঞ্চে যে-সকল বৌদ্ধ উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বক্তা বলিতে লাগিলেন :

হে বৌদ্ধগণ ! বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্ম বাঁচিতে পারে না ; হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া বৌদ্ধধর্মও বাঁচিতে পারে না। অতএব উপলব্ধি করুন–আমাদের এই বিযুক্ত বিচ্ছিন্নভাব স্পষ্টই দেখাইয়া দিতেছে যে, ব্রাহ্মণের ধীশক্তি ও দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য না লইয়া বৌদ্ধেরা দাঁড়াইতেপারে না এবং ব্রাহ্মণও বৌদ্ধের হৃদয় না পাইলে দাঁড়াইতে পারে না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের এই বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। এই জন্যই আজ ভারতবর্ষ ত্রিশকোটি ভিক্ষুকের বাসভূমি হইয়াছে, এইজন্যই ভারতবাসী সহস্র বৎসর ধরিয়া বিজেতাদের দাসত্ব করিতেছে। অতএব আসুন, আমরা ব্রাহ্মণের অপূর্ব ধীশক্তির সহিত লোকগুরু বুদ্ধের হৃদয়, মহান আত্মা এবং অসাধারণ লোক-কল্যাণশক্তি যুক্ত করিয়া দিই।

'এশিয়ার আলোক'—বুদ্ধদেবের ধর্ম

(ডেট্রয়েট শহরে ১৮৯৪ খ্রীঃ ১৯ মার্চ প্রদত্ত ; 'ডেট্রয়েট ট্রিবিউন' পত্রিকায় প্রকাশিত।)

বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মগুলির বিশদ পর্যালোচনা করেন। তিনি যজ্ঞবেদিতে বহুল প্রাণিবধের কথা বলিয়া বুদ্ধের জন্ম এবং জীবন-কাহিনী বর্ণনা করেন। সৃষ্টির কারণ এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বুদ্ধের মনে যে দুরূহ সমস্যাগুলি উঠিয়াছিল, ঐগুলির সমাধানের জন্য তিনি যে তীব্র সাধনা করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এ-সকল বিষয় বক্তা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, বুদ্ধ অপর সকল মানুষের উপরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যাঁহার সম্বন্ধে কি মিত্র, কি শত্রু-কেহ কখনো বলিতে পারে না যে, তিনি সকলের হিতের জন্য ছাড়া একটিও নিঃশ্বাস লইয়াছেন বা এক টুকরা রুটি খাইয়াছেন।

বিবেকানন্দ বলেন, আত্মার জন্মান্তরগ্রহণ বুদ্ধ কখনো প্রচার করেন নাই তবে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সমুদ্রে যেমন একটি ঢেউ উঠিয়া মিলাইয়া যাইবার সময় পরবর্তী ঢেউটিতে তাহার শক্তি সংক্রামিত করিয়া যায়, সেইরূপ একটি জীব তাহার উত্তরকালীনে নিজের শক্তি রাখিয়া যায়। বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব কখনো প্রচার করেন নাই ; আবার ঈশ্বর যে নাই, তাহাও বলেন নাই।

তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমরা সৎ হইব কেন ?' বুদ্ধ উত্তর দিলেন, 'কারণ তোমরা উত্তরাধিকাসূত্রে সদ্‌ভাব পাইয়াছ। তোমাদের ও উচিত পরবর্তীদের জন্য কিছু সদ্‌ভাব রাখিয়া যাওয়া।' সংসারে সমষ্টিকৃত সাধুতার সম্প্রসারের জন্যই আমাদের প্রত্যেকের সাধু আচরণ বিধেয়।

বুদ্ধ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অবতার। তিনি কাহারও নিন্দা করেন নাই, নিজের জন্য কিছু দাবি করেন নাই। নিজেদের চেষ্টাতেই আমাদিগকে মুক্তিলাভ করিতে হইবে ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। মৃত্যুশয্যায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি বা অপর কেহই তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না। কাহাও উপর নির্ভর করিও না। নিজের মুক্তি নিজেই সম্পাদন কর।

মানুষে মানুষে এবং মানুষে ও ইতরপ্রাণীতে অসাম্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধ পতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, সকল প্রাণীই সমান। তিনিই প্রথম মদ্যপান বন্ধ করার নীতি উপস্থাপিত করেন। তাঁহার শিক্ষা : সৎ হও, সৎ কাজ কর। যদি ঈশ্বর থাকেন, সাধুতার দ্বারা তাঁহাকে লাভ কর। যদি ঈশ্বর না-ও থাকেন, তবুও সাধুতাই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। মানুষের যাবতীয় দুঃখের জন্য সে নিজেই দায়ী। তাহার সমুদয় সদাচরণের জন্য প্রশংসা ও তাহারই প্রাপ্য।

বুদ্ধই প্রথম ধর্মপ্রচারকদলের উদ্ভাবক। ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতদিগের পবিত্রাতারূপে তাঁহার আবির্ভাব। উহারা তাঁহার দার্শনিক মত বুঝিতে পারিত না, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিত।

উপসংহারে বিবেকানন্দ বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি। ক্যাথলিক সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম হইতেই উদ্ভূত।

কর্মযোগী ভগবান বুদ্ধ

(আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েটে প্রদত্ত বক্তৃতা)

এক এক ধর্মে আমরা এক এক প্রকার সাধনার বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্মে নিষ্কাম কর্মের ভাবটাই বেশি প্রবল। আপনারা বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সম্বন্ধ-বিষয়ে ভুল বুঝিবেন না, এদেশে অনেকেই ঐরূপ করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, বৌদ্ধধর্ম সনাতনধর্মের সহিত সংযোগহীন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্ম ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, ইহা আমাদের সনাতন ধর্মেরই সম্প্রদায়বিশেষ। গৌতম নামক মহাপুরুষ কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত। তাৎকালিক অবিরত দার্শনিক বিচার, জটিল অনুষ্ঠানপদ্ধতি, বিশেষতঃ জাতিভেদের উপর তিনি অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, 'আমরা এক বিশেষ কুলে জন্মিয়াছি ; যাহারা এরূপ বংশে জন্মে নাই, তাহাদের অপেক্ষা আমরা শ্রেষ্ঠ।' ভগবান বুদ্ধ জাতিভেদের এইরূপ ব্যাখ্যার বিরোধী ছিলেন। তিনি পুরোহিত-ব্যবসায়ীদের অপকৌশলেরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি এমন এক ধর্ম প্রচার করিলেন, যাহাতে সকাম ভাবের লেশমাত্র ছিল না, আর তিনি দর্শন ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদ আলোচনা করিতে চাহিতেন না, ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। অনেকে অনেক সময় তাঁহাকে ঈশ্বর আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিতেন, 'ও সব আমি কিছু জানি না।' মানবের প্রকৃত কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, 'নিজে ভাল কাজ কর এবং ভাল হও।'

একবার তাঁহার নিকট পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের তর্কের মীমাংসা করিয়া দিতে বলিলেন। একজন বলিলেন, 'ভগবন, আমার শাস্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে এই এই কথা আছে।' অপরে বলিলেন, 'না, না, ও কথা ভুল ; কারণ আমার শাস্ত্র ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহাকে লাভ করিবার সাধন অন্য প্রকার বলিয়াছে।' এইরূপে অপরেও ঈশ্বরের স্বরূপ ও তৎপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে নিজ নিজ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে লাগিলেন। তিনি প্রত্যেকের কথা বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিয়া প্রত্যেককে এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, আপনাদের কাহারও শাস্ত্রে এ কথা বলে যে, ঈশ্বর ক্রোধী, হিংসাপরায়ণ বা অপবিত্র ?'

ব্রাহ্মণেরা সকলেই বলিলেন, 'না ভগবন, সকল শাস্ত্রেই বলে ঈশ্বর শুদ্ধ ও কল্যাণ।' ভগবান বুদ্ধ বলিলেন, 'বন্ধুগণ, তবে আপনারা কেন প্রথমে শুদ্ধ পবিত্র ও কল্যাণকারী হইবার চেষ্টা করুন না, যাহাতে আপনারা ঈশ্বর কি বস্তু

জানিতে পারেন?'

অবশ্য আমি তাঁহার মত সমর্থন করি না। আমার নিজের জন্যই আমি দার্শনিক বিচারের যথেষ্ট আবশ্যকতা বোধ করি। অনেক বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার সম্পূর্ণ মতভেদ আছে, কিন্তু মতভেদ আছে বলিয়াই যে আমি তাঁহার চরিত্রের তাঁহার ভাবের সৌন্দর্য দেখিব না, উহার কি কোন অর্থ আছে ? জগতের আচার্যগণের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই কার্যে কোনরূপ বাহিরের অভিসন্ধি ছিল না। অন্যান্য মহাপুরুষগণ সকলেই নিজদিগকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, আর ইহাও বলিয়া গিয়াছেন, 'আমাকে যাহারা বিশ্বাস করিবে, তাহারা স্বর্গে যাইবে।' কিন্তু ভগবান বুদ্ধ শেষ নিঃশ্বাসের সহিত কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াঠিলেন, 'কেহই তোমাকে মুক্ত হইতে সাহায্য করিতে পারে না, নিজের সাহায্য নিজে কর, নিজের চেষ্টা দ্বারা নিজের মুক্তিসাধন কর।' নিজের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'বুদ্ধ-শব্দের অর্থ আকাশের ন্যায় অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন। আমি গৌতম, সেই অবস্থা লাভ করিয়াছি ; তোমরাও যদি উহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর, তোমরাও উহা লাভ করিবে।'তিনি সর্ববিধ কামনা ও অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন, সুতরাং তিনি স্বর্গগমনের বা ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তিনি রাজসিংহাসনের আশা ও সর্ববিধ সুখ জলাঞ্জলি দিয়া ভারতের পথে পথে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা উদরপূরণ করিতেন এবং সমুদ্রের মতো বিশাল হৃদয় লইয়া নরনারী ও অন্যান্য জীবজন্তুর কল্যাণ যাহাতে হয়, তাহাই প্রচার করিতেন। জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি যজ্ঞে পশুহত্যা নিবারণের উদ্দেশ্যে পশুগণের পরিবর্তে নিজ জীবন বিসর্জনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি একবার জনৈক রাজাকে বলিয়াছিলেন, 'যদি যজ্ঞে ছাগশিশু হত্যা করিলে আপনার স্বর্গগমনের সহায়তা হয়, তবে নরহত্যা করিলে তাহাতে তো আরও অধিক উপকার হইবে, অতএব যজ্ঞস্থলে আমায় বধ করুন।' রাজা এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। অথচ এই মহাপুরুষ সর্ববিধ অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন। তিনি কর্মযোগীর আদর্শ ; আর তিনি যে উচ্চাবস্থায় আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝা যায়, কর্ম দ্বারা আমরাও আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারি।

অনেকের পক্ষে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারিলে সাধনপথ খুব সহজ হইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধের জীবনালোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি আদৌ ঈশ্বরের বিশ্বাসী না হয়, তাহার যদি কোন দার্শনিক মতে বিশ্বাস না থাকে, সে যদি কোন সমপ্রদায়ভুক্ত না হয়, অথবা কোন মন্দিরাদিতেও না যায়, এমনকি প্রকাশ্যে নাস্তিক বা জড়বাদীও হয়, তথাপি সে সেই চরমাবস্থা

লাভ করিতে সমর্থ। তাঁহার মতামত বা কার্যকলাপ বিচার করিবার অধিকার আমাদের কিছুমাত্র নাই। আমি যদি বুদ্ধের অপূর্ব হৃদয়বত্তার লক্ষভাগের একভাগেরও অধিকারী হইতাম, তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। হইতে পারে বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, অথবা হয়তো বিশ্বাস করিতেন না, তাহা আমার চিন্তনীয় বিষয় নয়। কিন্তু অপরে ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানের দ্বারা যে পূর্ণ অবস্থা লাভ করে, তিনি, তাহাই লাভ করিয়াছিলেন। কেবল ইহাতে উহাতে বিশ্বাস করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কেবল মুখে ধর্মের কথা, ঈশ্বরের কথা আওড়াইলেই কিছু হয় না। তোতা পাখিকেও যাহা শিখাইয়া দেওয়া যায়, তাহাই সে আবৃত্তি করিতে পারে। নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে পারিলেই তাহা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

বুদ্ধের ধর্ম

('বল্টিমোর আমেরিকান', ২২ অক্টোবর, ১৮৯৪)

'প্রাণবন্তধর্ম' সম্বন্ধে ভ্রাতৃমণ্ডলী যে বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার দ্বিতীয়টি শুনিবার জন্য গত রাত্রে লাইসিয়াম থিয়েটার গৃহ লোকে সম্পূর্ণ ভরিয়া গিয়াছিল। প্রধান বক্তা ছিলেন ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বলেন এবং বুদ্ধের জন্মের সময় ভারতবাসীর মধ্যে যে-সব দোষ ছিল, তাহার উল্লেখ করেন। ঐ সময়ে ভারতে সামাজিক অসাম্য পৃথিবীর অন্য যে-কোন অঞ্চল অপেক্ষা হাজার গুণ বেশি ছিল। খ্রীস্টের জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্বে ভারতীয় জনগণের মনে পুরোহিত-সম্প্রদায়ের খুব প্রভাব ছিল। বুদ্ধি-বিচার এবং বিদ্যাবত্তা–পেষণযন্ত্রের এই দুই পাথরের মধ্যে পড়িয়া জনসাধারণ নিষ্পিষ্ট হইতেছিল।

বৌদ্ধধর্ম একটি নূতন ধর্মরূপে স্থাপিত হয় নাই ; বরং উহার উৎপত্তি হইয়াছিল সেই সময়কার ধর্মের অবনতির সংশোধকরূপে। বুদ্ধই বোধ করি একমাত্র মহাপুরুষ যিনি নিজের দিকে বিন্দুমাত্র না তাকাইয়া সকল উদ্যম পরহিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। মানুষের দুঃখকষ্টরূপ ভীষণ ব্যাধির ঔষধ অন্বেষণের জন্য তিনি গৃহ এবং জীবনের সকল ভোগসুখ বিসর্জন দিয়াছিলেন। যে যুগে পণ্ডিত এবং পুরোহিতকুল ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বৃথা তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত, বুদ্ধ সেই সময়ে মানুষ যাহা খেয়াল করে না, জীবনের সেই একটি বিপুল বাস্তব সত্য আবিষ্কার করিলেন-দুঃখের অস্তিত্ব। আমরা অপরকে ডিঙাইয়া যাইতে চাই এবং আমরা স্বার্থপর বলিয়াই পৃথিবীতে এত অনিষ্ট ঘটে। যে মুহূর্তে জগতের সকলে নিঃস্বার্থ হইতে পারিবে, সেই মুহূর্তে সকল অশুভ তিরোহিত হইবে। সমাজ যতদিন আইন-কানুন এবং সংস্থানসমূহের মাধ্যমে অকল্যাণের প্রতিকার করিতে সচেষ্ট, ততদিন ঐ প্রতিকার অসম্ভব। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া জগৎ ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছে ; কোন ফল হয় নাই। হিংসা দ্বারা হিংসা জয় করা যায় না। নিঃস্বার্থপরতা দ্বারাই সকল অশুভ নিবারিত হয়। নূতন নূতন নিয়ম না করিয়া মানুষকে পুরাতন নিয়মগুলি পালন করিবার শিক্ষা দিতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর প্রথম প্রচারশীল ধর্ম, তবে অপর কোন ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা বৌদ্ধধর্মের অন্যতম শিক্ষা। সাম্প্রদায়িকতা মানবগোষ্ঠীর ভিতর পারস্পরিক সংঘর্ষ আনিয়া কল্যাণশক্তি হারাইয়া ফেলে।

প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম

('ব্রুকলিন স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন', ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫)

এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডক্টর জেন্‌স্ স্বামী বিবেকানন্দকে বক্তৃতামঞ্চে উপস্থাপিত করিলে তিনি তাঁহার ভাষণ আরম্ভ করেন। উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :

বৌদ্ধধর্ম-প্রসঙ্গে হিন্দুদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। যীশুখ্রীস্ট যেমন প্রচলিত ইহুদী ধর্মের প্রতিপক্ষতা করিয়াছিলেন, বুদ্ধও সেইরূপ ভারতবর্ষের তৎকালীন ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। খ্রীস্টকে তাঁহার দেশবাসীরা অস্বীকার করিয়াছিল, বুদ্ধ কিন্তু স্বদেশে ঈশ্বরাবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। যে-সব মন্দিরের দ্বারদেশে বুদ্ধ পৌরোহিত্য-ক্রিয়াকলাপের নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই-সকল মন্দিরেই আজ তাঁহার পূজা হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার নামে যে মতবাদ প্রচলিত হইয়াছিল, উহাতে হিন্দুদের আস্থা নাই। বুদ্ধ যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, হিন্দুরা তাহা শ্রদ্ধা করে, কিন্তু বৌদ্ধেরা যাহা প্রচার করে, তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহারা রাজি নয়। কারণ বুদ্ধের বাণী নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া বহু বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল। ঐ রঞ্জিত ও বিকৃত বাণীর ভারতীয় ঐতিহ্যের সহিত খাপ খাওয়া সম্ভবপর ছিল না।

বৌদ্ধধর্মকে পুরোপুরি বুঝিতে হইলে উহা যাহা হইতে উদ্ভূত, আমাদিগকে সেই মূল ধর্মটির দিকে অবশ্যই ফিরিয়া দেখিতে হইবে। বৈদিত গ্রন্থগুলির দুটি ভাগ প্রথম-কর্মকাণ্ড১, যাহাতে যাগযজ্ঞের কথা আছে, আর দ্বিতীয় হইল বেদান্ত-যাহা যাগযজ্ঞের নিন্দা করে, দান ও প্রেম শিক্ষা দেয়, মৃত্যুকে বড় করিয়া দেখায় না। বেদবিশ্বাসী যে সমপ্রদায়ের বেদের যে অংশে প্রীতি, সেই অংশই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। অবৈদিকদের মধ্যে চার্বাকপন্থী বা ভারতীয় জড়বাদীরা বিশ্বাস করিত যে, সব কিছু হইল জড় ; স্বর্গ, নরক, আত্মা বা ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই। দ্বিতীয় একটি সম্প্রদায়–জৈনগণও নাস্তিক, কিন্তু অত্যন্ত নীতিবাদী। তাহারা ঈশ্বরের ধারণাকে অস্বীকার করিত, কিন্তু আত্মা মানিত। আত্মা অধিকতর পূর্ণতার অভিব্যক্তির জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। এই দুই সম্প্রদায়কে অবৈদিক বলা হইত। তৃতীয় একটি সম্প্রদায় বৈদিক হইলেও ব্যক্তি-ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিত না। তাহারা বলিত বিশ্বজগতের সব কিছুর জনক হইল পরমাণু বা প্রকৃতি।

অতএব দেখা যাইতেছে, বুদ্ধের আর্বিভাবের পূর্বে ভারতের চিন্তা-জগৎ ছিল বিভক্ত। তাঁহার ধর্মের নির্ভুল ধারণা করিবার জন্য আর একটি বিষয়েরও

উল্লেখ প্রয়োজনীয়–উহা হইল সেই সময়কার জাতি-প্রথা। বেদ শিক্ষা দেয় যে, যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ ; যিনি সমাজের সকলকে রক্ষা করেন, তিনি খোক্ত (ক্ষত্রিয়) আর যিনি ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া অন্নসংস্থান করেন, তিনি বিশ (বৈশ্য)। এই সামাজিক বৈচিত্র্যগুলি পরে অত্যন্ত ধরাবাঁধা কঠিন জাতিভেদের ছাঁচে পরিণতি অর্থাৎ অবনতি লাভ করে এবং ক্রমে দৃঢ়-গঠিত সুসম্বদ্ধ একটি পৌরোহিত্য-শাসন সমগ্র জাতির কাঁধে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন ঠিক এই সময়েই। অতএব তাঁহার ধর্মকে ধর্মবিষয়ক ও সামাজিক সংস্কারের একটি চরম প্রয়াস বলা যাইতে পারে।

সেই সময়ে দেশের আকাশ-বাতাস বাদ-বিতণ্ডায় ভরিয়া আছে। বিশ হাজার অন্ধ পুরোহিত দুই কোটি পরস্পর-বিবদমান অন্ধ মানুষকে পথ দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে ! এইরূপ সঙ্কটকালে বুদ্ধের ন্যায় একজন জ্ঞানী পুরুষের প্রচারকার্য অপেক্ষা জাতির পক্ষে বেশি প্রয়োজনীয় আর কি থাকিতে পারে ? তিনি সকলকে শুনাইলেন- 'কলহ বন্ধ কর, পুঁথিপত্র তুলিয়া রাখ, নিজের পূর্ণতাকে বিকাশ করিয়া তোল।' জাতি-বিভাগের মূল তথ্যটির প্রতিবাদ বুদ্ধ কখনও করেন নাই, কেন না উহা সমাজ -জীবনের একটি স্বাভাবিক প্রবণতারই অভিব্যক্তি এবং সব সময়েই মূল্যবান। কিন্তু যাহা বংশগত বিশেষ সুবিধার দাবি করে, বুদ্ধ সেই অবনত জাতিপ্রথার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণকে তিনি বলিলেন, 'প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা লোভ, ক্রোধ এবং পাপকে জয় করিয়া থাকেন। তোমরা কি ঐরূপ করিতে পারিয়াছ ? যদি না পারিয়া থাক, তাহা হইলে আর ভণ্ডামি করিও না। জাতি হইল চরিত্রের একটি অবস্থা, উহা কোন কঠোর গণ্ডিবদ্ধ শ্রেণী নয়। যে- কেহ ভগবানকে জানে ও ভালবাসে, সে-ই যর্থাথ ব্রাহ্মণ।' যাগ-যজ্ঞ সম্বন্ধে বুদ্ধ বলিলেন, 'যাগ-যজ্ঞ আমাদিগকে পবিত্র করে, এমন কথা বেদে কোথায় আছে ? উহা হয়তো দেবতাগণকে সুখী করিতে পারে, কিন্তু আমাদের কোন উন্নতি সাধন করে না। অতএব এই-সব নিষ্ফল আড়ম্বরে ক্ষান্তি দিয়া ভগবানকে ভালবাস এবং পূর্ণতালাভ করিবার চেষ্টা কর।'

পরবর্তী কালে বুদ্ধের এইসকল শিক্ষা লোকে বিস্মৃত হয়। ভারতের বাহিরে এমন অনেক দেশে উহা প্রচারিত হয়, যেখানকার অধিবাসীদের এই মহান সত্যসমূহ গ্রহণের যোগ্যতা ছিল না। এই-সকল জাতির বহুতর কুসংস্কার ও কদাচারের সহিত মিশিয়া বুদ্ধবাণী ভারতে ফিরিয়া আসে এবং কিম্ভুতকিমাকার মতসমূহের জন্ম দিতে থাকে। এই ভাবে উঠে শূন্যবাদী সম্প্রদায়, যাহার মতে বিশ্বসংসার, ভগবান এবং আত্মার কোন মূলভিত্তি নাই। সবকিছুই নিয়ত পরিবর্তনশীল। ক্ষণকালের সম্ভোগ ব্যতীত অন্য কিছুতেই তাহারা বিশ্বাস করিত

পরিবর্তনশীল। ক্ষণকালের সম্ভোগ ব্যতীত অন্য কিছুতেই তাহারা বিশ্বাস করিত না। ইহার ফলে এই মত পরে অতি জঘন্য কদাচারসমূহ সৃষ্টি করে। যাহা হউক উহা তো বুদ্ধের শিক্ষা নয়, বরং তাঁহার শিক্ষার ভয়াবহ অধোগতি মাত্র। হিন্দুজাতি যে ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এই কুশিক্ষাকে দূর করিয়া দিয়াছিল, এজন্য তাহারা অভিনন্দনীয়।

বুদ্ধের প্রত্যেকটি বাণী বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত-গ্রন্থে এবং অরণ্যের মঠসমূহে লুক্কায়িত সত্যগুলিকে যাঁহারা সকলের গোচরীভূত করিতে চাহিয়াছেন, বুদ্ধ সেইসকল সন্ন্যাসীর একজন। অবশ্য আমি বিশ্বাস করি না যে, জগৎ এখনও ঐ-সকল সত্যের জন্য প্রস্তুত। লোকে এখন ও ধর্মের নিম্নতর অভিব্যক্তিগুলিই চায়, যেখানে ব্যক্তি-ঈশ্বরের উপদেশ আছে। এই কারণেই মৌলিক বৌদ্ধধর্ম জনগণের চিত্তকে বেশিদিন ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তিব্বত ও তাতার দেশগুলি হইতে আমদানী বিকৃত আচারসমূহের প্রচলন যখন হইল, তখনই জনগণ দলে দলে বৌদ্ধধর্মে ভিড়িয়াছিল। মৌলিক বৌদ্ধধর্ম আদৌ শূন্যবাদ নয়। উহা জাতিভেদ ও পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম প্রচেষ্টা মাত্র। বৌদ্ধধর্মই পৃথিবীতে প্রথম মূক ইতর প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি ঘোষনা করে এবং মানুষে মানুষে বিভেদ-সৃষ্টিকারী আভিজাত্যপ্রথাকে ভাঙিয়া দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন বুদ্ধের জীবনের কয়েকটি চিত্র উপস্থিত করিয়া। তাঁহার ভাষায় বুদ্ধ ছিলেন 'এমন একজন মহাপুরুষ, যাঁহার মনে একটি মাত্র চিন্তাও উঠে নাই বা যাঁহার দ্বারা একটি মাত্র কাজও সাধিত হয় নাই, যাহা মানুষের হিতসাধন ব্যতীত অপর কোন উদ্দেশ্যে চালিত। তাঁহার মেধা এবং হৃদয় উভয়ই ছিল বিরাট–তিনি সমুদয় মানবজাতি এবং প্রাণিকুলকে প্রেমে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং কি উচ্চতম দেবদূত, কি নিম্নতম কীটটির জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।' বুদ্ধ কিভাবে জনৈক রাজার যজ্ঞে বলিদানের উদ্দেশ্যে নীত একটি মেষযূথকে বাঁচাইবার জন্য নিজেকে যূপকাষ্ঠে নিক্ষেপ করিয়া স্বকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন, বক্তা প্রথমে তাহা বর্ণনা করেন। তারপর তিনি চিত্রিত করেন-দুঃখসন্তপ্ত মানুষের ক্রন্দনে ব্যথিত এই মহাপুরুষ কিভাবে স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে ত্যাগ করেন, পরে তাঁহার শিক্ষা ভারতে সর্বজনীনভাবে যখন গৃহীত হইল, তখন কিভাবে তিনি জনৈক নীচকুলোদ্ভব পারিয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তৎপ্রদত্ত শূকর-মাংস আহার করেন এবং উহার ফলে অবশেষে মৃত্যু বরণ করেন।

বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্ত

বৌদ্ধধর্মের ও ভারতের অন্যান্য সকল ধর্মমতের ভিত্তি বেদান্ত। কিন্তু যাহাকে আমরা আধুনিক কালের অদ্বৈত দর্শন বলি, উহার অনেকগুলি সিদ্ধান্ত বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুরা অর্থাৎ সনাতন-পন্থী হিন্দুরা অবশ্য ইহা স্বীকার করিবে না। তাহাদের নিকট বৌদ্ধেরা বিরুদ্ধবাদী পাষণ্ড। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধগণকেও অর্ন্তভুক্ত করিবার জন্য সমগ্র মতবাদটি প্রসারিত করার একটি সচেতন প্রয়াস রহিয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের সহিত বেদান্তের কোন বিবাদ নাই বেদান্তের উদ্দেশ্য সকল মতের সমন্বয় করা। মহাযানী বৌদ্ধদের সহিত আমাদের কোন কলহ নাই, কিন্তু বর্মী, শ্যামদেশীয় ও সমস্ত হীনযানীরা বলে যে, পরিদৃশ্যমান জগৎ একটি আছে এবং জিজ্ঞাসা করে : এই দৃশ্যজগতের পশ্চাতে একটি অতীন্দ্রিয় জগৎ সৃষ্টি করিবার কি অধিকার আমাদের আছে ? বেদান্তের উত্তর : এই উক্তি মিথ্যা। বেদান্ত কখনও স্বীকার করে না যে, একটি দৃশ্যজগৎ ও একটি অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে ; একটি মাত্র জগৎ আছে। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখিলে উহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা সব সময়েই ইন্দ্রিয়াতীত। যে রজ্জু দেখে, সে সর্প দেখে না। উহা হয় রজ্জু, না হয় সর্প ; কিন্তু একসঙ্গে কখনও দুইটি নয়। সুতরাং বৌদ্ধেরা যে বলে, আমরা হিন্দুরা দুইটি জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, উহা সর্বৈব ভুল। ইচ্ছা করিলে জগৎকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিবার অধিকার তাহাদের আছে, কিন্তু ইহাকে ইন্দ্রিয়াতীত বলিবার কোন অধিকার অপরের নাই–এ-কথা বলিয়া বিবাদ করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই।

বৌদ্ধধর্ম দৃশ্য জগৎ ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার করিতে চায় না। একমাত্র দৃশ্য -জগতেই তৃষ্ণা আছে। তৃষ্ণাই এই সব-কিছু সৃষ্টি করিতেছে। আধুনিক বৈদান্তিকেরা কিন্তু এই মত আদৌ গ্রহণ করে না। আমরা বলি, একটা কিছু আছে, যাহা ইচ্ছায় পরিণত হইয়াছে। ইচ্ছা একটি উৎপন্ন বস্তু–যৌগিক পদার্থ, 'মৌলিক' নয়। একটি বাহ্যবস্তু না থাকিলে কোন ইচ্ছা হইতে পারে না। ইচ্ছা হইতে জগতের সৃষ্টি–এই সিদ্ধান্তের অসম্ভাব্যতা আমরা সহজেই দেখিতে পাই। ইহা কি করিয়া হইতে পারে? বাহিরের প্রেরণা ছাড়া ইচ্ছার উৎপত্তি হইতে কখনও দেখিয়াছ কি? উত্তেজনা ব্যতীত, অথবা আধুনিক দর্শনের পরিভাষার স্নায়বিক উত্তেজনা ব্যতীত বাসনা উঠিতে পারে না। ইচ্ছা মস্তিষ্কের একপ্রকার প্রতিক্রিয়া-বিশেষ, সাংখ্যাবাদীরা ইহাকে বলে 'বুদ্ধি'। এই প্রতিক্রিয়ার পূর্বে

ক্রিয়া থাকিবেই, এবং ক্রিয়া থাকিলেই একটি বাহ্যজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যখন স্থূল জগৎ থাকে না, তখন স্বভাবতই ইচ্ছাও থাকিবে না ; তথাপি তোমাদের মতে ইচ্ছাই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। ইচ্ছা সৃষ্টি করে কে ? ইচ্ছা জগতের সহিত সহাবস্থিত। যে উত্তেজনা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, উহাই ইচ্ছা নামক পদার্থও সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু দর্শন নিশ্চয়ই এখানে থামিবে না। ইচ্ছা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। সুতরাং জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি না। ইচ্ছা একটি যৌগিক পদার্থ–বাহিরের ও ভিতরের মিশ্রণ। মনে কর একটি মানুষ কোন ইন্দ্রিয় ছাড়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে লোকটির আদৌ ইচ্ছা থাকিবে না। ইচ্ছার জন্য প্রয়োজন কোন বাহ্য বিষয়ের, এবং মস্তিষ্ক ভিতর হইতে কিছু শক্তি লাভ করে। কাজেই দেওয়াল বা অন্য যে-কোন বস্তু যতখানি যৌগিক পদার্থ, ইচ্ছাও ঠিক ততখানি যৌগিক পদার্থ। জার্মান দার্শনিকদের ইচ্ছাশক্তি-বিষয়ক মতবাদের সহিত আমরা মোটেই একমত হইতে পারি না। ইচ্ছা নিজেই জ্ঞেয় পদার্থ, কাজেই উহা পরম সত্তা হইতে পারে না। ইহা বহু অভিক্ষেপের অন্যতম। এমন কিছু আছে যাহা ইচ্ছা নয়, কিন্তু ইচ্ছারূপে প্রকাশিত হইতেছে-এ-কথা আমি বুঝিতে পারি : কিন্তু ইচ্ছা নিজেই প্রত্যেক বস্তুরূপে প্রকাশিত হইতেছে–এ-কথা বুঝিতে পারি না ; কারণ আমরা দেখিতেছি যে, জগৎ হইতে স্বতন্ত্ররূপে ইচ্ছার রূপান্তরিত হয়, তখন দেশ, কাল ও নিমিত্ত দ্বারা সেই রূপান্তর ঘটে। ক্যান্টের বিশ্লেষণ ধর। ইচ্ছা-দেশ, কাল ও নিমিত্তের মধ্যে আবদ্ধ। তাহা হইলে ইহা কি করিয়া পরম সত্তা হইবে ? কালের মধ্যে থাকিয়া ইচ্ছা না করিলে কেহ ইচ্ছা করিতে পারে না।

সমস্ত চিন্তারুদ্ধ করিতে পারিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা চিন্তার অতীত। নেতি নেতি বিচার করিয়া যখন সব দৃশ্যজগতকে অস্বীকার করা হয়, তখন যাহা কিছু থাকে, তাহাই এই পরম সত্তা। ইহাকে প্রকাশ করা যায় না, ইহা অভিব্যক্ত হয় না; কারণ অভিব্যক্তি পুনরায় ইচ্ছায় পরিণত হইবে।

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার সংকলন

বুদ্ধ ও যীশু জগতে যে মহাশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাঁহা কোথা হইতে আসিল? এই শক্তিসমষ্টি কোথা হইতে আসিল ? অবশ্য উহা যুগযুগান্তর হইতে ঐ স্থানেই ছিল ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছিল। অবশেষে উহা বুদ্ধ বা যীশু নামে প্রবল শক্তি আকারে সমাজে আবির্ভূত হইল। এখনও ঐ শক্তিতরঙ্গ হইয়া চলিয়াছে। (১: ৩৯/৪০)

তোমরা কি দেখ নাই, খুব গোঁড়া খ্রীস্টানও যখন এডুইন আর্নল্ডের 'এশিয়ার আলোক' (Light of Asia) পাঠ করেন, তখন তিনিও বুদ্ধের প্রতি কেমন শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন–যে বুদ্ধ ঈশ্বরের কথা বলেন নাই, আত্মত্যাগ ব্যতীত আর কিছুই প্রচার করেন নাই ? (১:৮৯)

উপসংহারে অল্প কথায় তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির বিষয়ে বলিব, যিনি কর্মযোগের এই শিক্ষা কার্যে পরিণত করিয়াছেন। সেই ব্যক্তি বুদ্ধদেব ; একমাত্র তিনি ইহা সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ব্যতীত জগতের অনান্য মহাপুরুষগণের সকলেই বাহ্য প্রেরণার বশে নিঃস্বার্থ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কারণ এই একটি ব্যক্তি ছাড়া জগতের মহাযুরুষগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে : এক শ্রেণী বলেন–তাঁহারা ঈশ্বরের অবতার, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অপর শ্রেণী বলেন–তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেরিত বার্তাবহ ; উভয়েরই কার্যের প্রেরণা-শক্তি বাহির হইতে আসে ; আর যত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাষা ব্যবহার করুন না কেন, তাঁহার বর্হিজগৎ হইতেই পুরস্কার আশা করিয়া থাকেন। কিন্তুমহাপুরুষগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই বলিয়াছিলেন, 'আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে চাই না। আত্মা সম্বন্ধে সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম মতবাদ বিচার করিয়াই বা কি হইবে? ভাল হও এবং ভাল কাজ কর। ইহাই তোমাদের মুক্তি দিবে, এবং সত্য যাহাই হউক না, সেই সত্যে লইয়া যাইবে।'

তিনি আচরণে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত-অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন ; আর কোন্ মানুষ তাঁহা অপেক্ষা বেশি কাজ করিয়াছেন? ইতিহাসে এমন একটি চরিত্র দেখাও, যিনি সকলের উপরে এত উর্ধ্বে উঠিয়াছেন! সমুদয় মনুষ্যজাতির মধ্যে এইরূপ একটিমাত্র চরিত্র উদ্ভূত হইয়াছে, যেখানে এত উন্নত দর্শন ও এমন উদার সহানুভূতি ! এই মহান দার্শনিক শ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচার করিয়াছেন,

আবার অতি নিম্নতম প্রাণীর জন্যও গভীরতম সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, নিজের জন্য কিছুই দাবি করেন নাই। বাস্তবিক তিনিই আদর্শ কর্মযোগী–সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া তিনি কাজ করিয়াছেন ; মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যাইতেছে–যত মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তিনিই তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হৃদয় ও মস্তিষ্কের অপূর্ব সমাবেশ–অতুলনীয় বিকশিত আত্মশক্তির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ! জগতে তিনিই প্রথম একজন মহান সংস্কারক। তিনিই প্রথম সাহসপূর্বক বলিয়াছেন, 'কোন প্রাচীন পুঁথিতে কোন বিষয় লেখা আছে বলিয়া বা তোমার জাতীয় বিশ্বাস বলিয়া অথবা বাল্যকাল হইতে তোমাকে বিশ্বাস করিতে শেখানো হইয়াছে বলিয়াই কোন কিছু বিশ্বাস করিও না ; বিচার করিয়া, তারপর বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া যদি দেখ–উহা সকলের পক্ষে উপকারী, তবেই উহা বিশ্বাস কর, ঐ উপদেশমত জীবনযাপন কর এবং অপরকে ঐ উপদেশ অনুসারে জীবনযাপন করিতে সাহায্য কর'।

যিনি অর্থ, যশ বা অন্য কোন অভিসন্ধি ব্যতীতই কর্ম করেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা ভাল কর্ম করেন ; এবং মানুষ যখন এরূপ কর্ম করিতে সমর্থ হইবে, তখন সেও একজন বুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাঁহার ভিতর হইতে এরূপ কর্মশক্তি উৎসারিত হইবে, যাহা জগতের রূপ পরিবর্তিত করিয়া ফেলিবে। এরূপ ব্যক্তিই কর্মযোগের চরম আদর্শের দৃষ্টান্ত। (১:১১৪)

বুদ্ধদেব দেবতা ঈশ্বর প্রভৃতি ব্যাপারে মন দিতেন না। সাধারণ লোক তাঁহাকে নাস্তিক ও জড়বাদী আখ্যা দিয়াছিল, কিন্তু তিনি একটি সামান্য ছাগশিশুর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। মনুষ্যজাতির পক্ষে সর্বোচ্চ যে নীতি গ্রহণীয় হইতে পারে, বুদ্ধদেব তাঁহাই প্রচার করিয়াছিলেন। যেখানেই কোনপ্রকার নীতির বিধান দেখিবে, সেখানেই তাঁহার প্রভাব, তাঁহার লক্ষ্য করিবে। (২:৮১)

এ সম্বন্ধে 'ললিতবিস্তরে' লিখিত বুদ্ধচরিতের একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত আমাদের মনে পড়ে। এইরূপ বর্ণিত আছে–বুদ্ধদেব মানবের পরিত্রাতারূপে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু রাজবাটীর বিলাসিতায় আত্মবিস্মৃত হওয়ায় তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য দেবকন্যাগণ একটি সঙ্গীত গাহিয়াছিল। সে সঙ্গীতের মমার্থ এই : 'আমরা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি, অবিরত পরিবর্তিত হইতেছি–নিবৃত্তি নাই, বিরাম নাই।' এইরূপ আমাদের জীবন বিরাম জানে না–অবিরত চলিয়াছে। (২:৪)

আমি বুদ্ধের দাসানুদাসেও দাস। সেই মহাপ্রাণ প্রভুর মতো কেউ কি

কখনো হয়েছে? তিনি নিজের জন্য একটি কর্মও করলেন না, তাঁর হৃদয় দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে আলিঙ্গন করেছিলেন। সেই রাজকুমার এবং সন্ন্যাসীর এত দয়া যে, তিনি একটা সামান্য ছাগ-শিশুর জন্য নিজের জীবন দিতে উদ্যত হলেন ; তাঁর এত ভালবাসা যে, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রীর সামনে নিজেকে সর্পে দিলেন, একজন অন্ত্যজের আতিথ্য গ্রহণ করে তাকে আশীর্বাদ করলেন। আমি যখন সামান্য বালকমাত্র, তখন আমি তাঁকে আমার ঘরে দর্শন করেছিলাম এবং তাঁর পদতলে আত্মসর্মপণ করেছিলাম, কারণ আমি জেনেছিলাম যে, তিনি সেই প্রভু স্বয়ং।
(১০:২২৭)

বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই–তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি।

আমি সেই গৌতম বুদ্ধেরর ন্যায় চরিত্রবান লোক দেখিতে চাই, যিনি সগুণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না, যিনি ঐ বিষয়ে কখনও কোন প্রশ্নই করেন নাই, যিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, কিন্তু সকলের জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন–সারা জীবন সকলের উপকার করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সারা জীবন কিসে অপরের কল্যাণ হয়, ইহাই তাঁহার চিন্তা ছিল। তাঁহার জীবনচরিত-লেখক বেশ বলিয়াছেন, তিনি 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বনে গিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন, তাহাও নিজের মুক্তির জন্য নয়। জগৎ জ্বলিয়া গেল–বাঁচিবার পথ বাহির করিতেই হইবে। জগতে এত দুঃখ কেন ?–তাঁহার সারাজীবন এই এক চিন্তা ছিল। তোমরা কি মনে কর, আমরা তাঁহার মতো নীতিপরায়ণ? (২:২১৬/২১৭)

এক্ষণে তোমরা বুদ্ধদেবের উপদেশ মনোযোগের সহিত শোন–তিনি জগতে মহতী বার্তা ঘোষণা করিতে আসিয়াছিলেন ; তাঁহার বাণী আমাদের হৃদয়ের একদেশ অধিকার করিয়া থাকে। বুদ্ধ বলিতেছেন, স্বার্থপরতা এবং যাহা কিছু তোমাকে স্বার্থপর করিয়া ফেলে, তাহাই একেবারে উন্মূলিত কর। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া (স্বার্থপর) সংসারী হইও না, সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হও।

প্রভু তোমাদের নিকট বুদ্ধরূপে আসিয়া শিখাইলেন তোমাদিগকে গরিবের জন্য, দুঃখীর জন্য, পাপীর জন্য প্রাণ কাঁদাইতে, তাহাদের সহিত সহানুভূতি করিতে: কিন্তু তোমরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলে না। তোমাদের পুরোহিতগণ–ভগবান ভ্রান্তমত-প্রচার দ্বারা অসুরদিগকে মোহিত করিতে আসিয়াছিলেন, এই ভয়ানক গল্প বানাইলেন। (৬:২৮৬)

কশাঘাত করিয়া আমাদিগকে কর্মে তৎপর করিবার জন্যই বুদ্ধের আবির্ভাব। সৎ হও, রিপুগুলি দমন কর। তখন নিজেই জানিতে পারিবে, দ্বৈত বা অদ্বৈত দর্শনের কোন্‌টি সত্য–তত্ত্ব এক বা বহু। (১০:১৪১)

যে everything for others ('যাহা কিছু সব পরের জন্য'–এই মত) তিব্বতে বিস্তৃত দেখিতেছ, ঐ phase of Buddhism (বৌদ্ধধর্মের ঐ ভাব) আজকাল ইউরোপকে বড় strike করিয়াছে (ইউরোপে বড় মনে লাগিয়াছে)। যাহা হউক, phase (ভাব) সম্বন্ধে আমার বলিবার অনেক আছে, এ পত্রে তাহা হইবার নহে। যে ধর্ম উপনিষদে জাতিবিশেষে বদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙিয়া সরল কথায় চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন। নির্বাণে তাঁহার মহত্ত্ব বিশেষ কি ? তাঁহার মহত্ত্ব in his unrivalled sympathy (তাঁহার অতুলনীয় সহানুভূতিতে)। তাঁহার ধর্মে যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতির গুরুত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে ; নাই তাঁহার intellect (বুদ্ধি) এবং heart (হৃদয়), যাহা জগতে আর হইল না। (৬:২৪৭)

এ জগতে জানিবার কিছুই নাই, অতএব যদি এই relative এর (মায়িক জগতের) পার কিছু থাকে-- যাকে শ্রীবুদ্ধ 'প্রজ্ঞাপারম্' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন-- যদি থাকে, তাহাই চাই! তাহাতে দুঃখ আসে বা সুখ আসে। do not care (আমি গ্রাহ্য করি না)। কি উচ্চাভাব! কি মহান ভাব। (৬:২৪৮)

..... আমি একমাত্র কর্ম বুঝি–পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম। তাই শ্রীবুদ্ধের পদানত হই। (৭:১১১)

বুদ্ধাবতার প্রভু বলিতেছেন যে, এই আধিভৌতিক দুঃখের কারণ 'জাতি', অর্থাৎ জন্মগত বা গুণগত বা ধনগত সর্বপ্রকার জাতিই এই দুঃখের কারণ। (৭:১৬৬)

তবে আমার বিশ্বাস, ভগবান বুদ্ধদেবের পর থেকেই ভারতবর্ষে এই ত্যাগব্রত বিশেষরূপে প্রচারিত হয়েছে এবং বৈরাগ্য ও বিষয়বিতৃষ্ণাই ধর্মের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের সেই ত্যাগ-বৈরাগ্য হিন্দুধর্ম absorb (নিজের ভিতরে হজম) করে নিয়েছে। ভগবান বুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর জন্মায়নি। (৯:২৭)

সন্ন্যাসাশ্রাম ছিল, কিন্তু উহাই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে সাধারণের জানা ছিল না, বৈরাগ্যে দৃঢ়তা ছিল না, বিবেক-নিষ্ঠা ছিল না। সেই জন্য বুদ্ধদেব কত যোগী, কত সাধুর কাছে গিয়ে শান্তি পেলেন না। তারপর "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং"[১] বলে আত্মজ্ঞানলাভের জন্য নিজেই বসে পড়লেন এবং প্রবুদ্ধ হয়ে তবে উঠলেন। ভারতবর্ষের এই যে সব সন্ন্যাসীর মঠ-ফঠ দেখতে পাচ্ছিস--- এ-সব বৌদ্ধদের অধিকার ছিল, হিন্দুরা সেই–সকলকে এখন তাদের রঙে রঙিয়ে নিজস্ব করে বসেছে। ভগবান বুদ্ধদেব হতেই যথার্থ সন্ন্যাসাশ্রমের

১. ললিত বিস্তর

সূত্রপাত হয়েছিল। তিনিই সন্ন্যাসাশ্রমের মৃতকঙ্কালে প্রাণসঞ্চার করে গেছেন। (৯:২৮)

History–কে (ইতিহাসকে) authority (প্রমাণ) বলে মানলে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে পুরাকালের ঘোর অন্ধকারে ভগবান বুদ্ধদেবই একমাত্র জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। (৯:২৮)

বুদ্ধ অন্য সকল ধর্মাচার্যের চেয়ে বেশি সাহসী ও অকপট ছিলেন। তিনি বলে গেছেন যে, 'কোন শাস্ত্রে বিশ্বাস করো না। বেদ মিথ্যা। যদি আমার উপলব্ধির সঙ্গে বেদ মেলে, সে বেদেরই সৌভাগ্য। আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র ; যাগযজ্ঞ ও দেবোপাসনায় কোন ফল নেই।' মনুষ্যজাতির মধ্যে বুদ্ধই জগৎকে প্রথমে সর্বাঙ্গসম্পন্ন নীতিবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। মঙ্গলের জন্যই তিনি মঙ্গলময় জীবন যাপন করতেন, ভালবাসার জন্যই তিনি ভালবাসতেন ; তাঁর অন্য অভিসন্ধি কিছু ছিল না। (৪:১৯০)

বুদ্ধ কখনো কারও কাছে মাথা নোয়াননি ; বেদ, জাতিভেদ, পুরোহিত বা সামাজিক প্রথা--- কারও কাছে নয়। যতদূর পর্যন্ত যুক্তিবিচার চলতে পারে, ততদূর নির্ভীকভাবে তিনি যুক্তিবিচার করে গেছেন। এরূপ নির্ভীক সত্যানুসন্ধান, আবার সকল প্রাণীর প্রতি এমন ভালবাসা-- জগতে কেউ কখনো দেখেনি। বুদ্ধ যেন ধর্মজগতের ওয়াশিংটন ছিলেন, তিনি সিংহাসন জয় করেছিলেন শুধু জগৎকে দেবার জন্য, যেমন ওয়াশিংটন মার্কিনজাতির জন্য করেছিলেন। তিনি নিজের জন্য কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করতেন না। (৪:২০৮)

কিন্তু দেখ বুদ্ধদেবের হৃদয়! 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' কা কথা, সামান্য একটা ছাগশিশুর জীবনরক্ষার জন্য নিজ-জীবন দান করতে সর্বদা প্রস্তুত ! দেখ দেখি কি উদারতা--- কি দয়া ! (৯:৭২)

বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল, ছয় শতাব্দী যাইতে না যাইতে সে তাহার সর্বোচ্চ গৌরব শিখরে আরোহণ করিল।

কিন্তু তাঁর ঐ fanaticism এ জগতের জীবের কত কল্যাণ হলো–তা দেখ! কত আশ্রম -- স্কুল কলেজ, কত public hospital (সাধারণের জন্য হাসপাতাল), কত পশুশালার স্থাপন, কত স্থাপত্যবিদ্যার বিকাশ হলো, তা ভেবে দেখ ! বুদ্ধদেব জন্মাবার আগে এ দেশে এ-সব ছিল কি?-- তালপাতার পুঁথিতে বাঁধা কতকগুলো ধর্মতত্ত্ব -- তাও অল্প কয়েকজনের জানা ছিল মাত্র। ভগবান বুদ্ধদেব সেগুলি practical field-এ (কার্যক্ষেত্রে) আনলেন, লোকের

দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো কেমন করে কাজে লাগাতে হবে, তা দেখিয়ে দিলেন। ধরতে গেলে তিনিই যথার্থ বেদান্তের স্ফুরণমূর্তি। (৯:৭২)

এই অবস্থায় বুদ্ধদেব আসিয়া সাধারণের মধ্যে বেদান্ত প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা করিলেন। (২:৭৭)

বুদ্ধ যদি মুহূর্তের জন্যও আপস করতেন, তবে তাঁর জীবিতকালেই সারা এশিয়াতে তিনি ইশ্বর বলে পূজিত হতেন। তাঁর উত্তর ছিল কেবল এই-বুদ্ধত্ব একটি অবস্থা প্রাপ্তি মাত্র কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়। বস্তুতঃ দেহধারীদের মধ্যে তাঁকেই একমাত্র প্রকৃত জ্ঞানী বলা যায়। (১০:২২২/২২৩)

বৌদ্ধধর্ম

এই বৌদ্ধধর্মই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্রচারশীল ধর্ম, তৎকালীন সমুদয় সভ্যজগতের সর্বত্র ইহা প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্য একটি বিন্দু রক্তপাত হয় নাই। আমরা পড়িয়াছি, কিরূপে চীনদেশে বৌদ্ধ প্রচারকগণ নির্যাতিত হন, এবং সহস্র বৌদ্ধ ক্রমান্বয়ে দুই তিন জন সম্রাট কর্তৃক নিহত হন, কিন্তু তারপর যখন বৌদ্ধদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল এবং একজন সম্রাট উৎপীড়নকারীদিগের উপর প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন, তখন ভিক্ষুগণ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। (৩:১৫৫)

এই ধর্ম-প্রচারের জন্য সৈন্যগণের রণযাত্রার প্রয়োজন হয় নাই। পৃথিবীর অন্যতম প্রধান প্রচারশীল ধর্ম বৌদ্ধধর্মে আমরা দেখি, প্রথিতযশা সম্রাট অশোকের শিলালিপিসমূহ সাক্ষ্য দিতেছে, কিরূপে একদা বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকেরা আলেকজান্দ্রিয়া, আন্টিওক, পারস্য, চীন প্রভৃতি তদানীন্তন সভ্য জগতের বহুদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। (৩:২৪৩)

বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের শৃঙ্খল মোচন করিল। এক মুহূর্তে সকল জাতি ও সম্প্রদায় সমান হইয়া গেল। (৮:২৭৫)

বৌদ্ধধর্ম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই : বৌদ্ধধর্ম বলছে–সমস্ত কিছু ভ্রম বলেই জেনো ; আবার হিন্দুধর্ম বলছে–জেনো যে, এই ভ্রমের (মায়া) মধ্যে সত্য বিরাজ করছে। (১০:২২৩/২২৪)

পূজানুষ্ঠানে পশুবলি নিবারণ করিয়া, বংশগত জাতিভেদ ও পুরোহিতকুলের আধিপত্য লুপ্ত করিয়া এবং আত্মার নিত্যত্বে অবিশ্বাস করিয়া বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য ছিল বৈদিক ধর্মের সংস্কার করা। বৌদ্ধধর্ম কখনও হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করিতে চাহে নাই, প্রচলিত সমাজব্যবস্থাও বিপর্যস্ত করিতে চাহে নাই। বৌদ্ধগণ একদল ত্যাগী সাধুকে একটি সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ে সুগঠিত করিয়াছিল, কতিপয় ব্রহ্মবাদিনী নারীকে সন্ন্যাসিনীরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল, আর যজ্ঞবেদীর স্থানে সিদ্ধ মহাপুরুষদের প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়াছিল। এই ভাবেই প্রাণশক্তিসম্পন্ন একটি পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল।... (৫:৩০৩)

এই পূর্বাঞ্চলই বৌদ্ধদিগের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল এবং সেখানেই তাহাদের সংস্কারমূলক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হয়। আবার যখন মৌর্য নরপতিগণ সম্ভবতঃ নিজেদের ক্ষতিকর কুলকলঙ্কচিহ্ন স্খালন করিবার জন্য বাধ্য হইয়া ঐ নূতন আন্দোলনকে–শুধু সমর্থন নয়–পরিচালিতও করিয়াছিলেন,তখন নূতন পুরোহিত-শক্তি পাটলিপুত্রের রাজশক্তির সহিত হাত মিলাইয়াছিল।

একদিকে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা এবং নূতন প্রাণশক্তি যেমন মৌর্য রাজন্যবর্গকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ সম্রাটরূপে গৌরবান্বিত করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি মৌর্যরাজশক্তির সাহায্যেই বৌদ্ধধর্ম সমগ্র বিশ্বে প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত তাহার চিহ্ন আমরা দেখিতে পাইতেছি। (৫:৩০৪)

ধর্মসমাজে ত্যাগীদের মধ্যে, বৌদ্ধ যতিগণের মঠে স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী বিশেষরূপে পরিবর্ধিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন যথেষ্ট আছে। (৬:১৭৫)

বৌদ্ধপ্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের শক্তির ক্ষয় ও রাজন্যবর্গের শক্তির বিকাশ।

বৌদ্ধযুগের পুরোহিত সর্বত্যাগী, মঠাশ্রয়, উদাসীন। 'শাপেন চাপেন বা' রাজকুলকে পদানত করিয়া রাখিতে তাঁহাদের উৎসাহ বা ইচ্ছা নাই। থাকিলেও আহুতিভোজী দেবকুলের অবনতির সহিত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাও নিম্নাভিমুখী; কত শত ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত নরদেবের চরণে প্রণত এবং এই বুদ্ধত্বে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার। (৬:১৭৫)

জগতের উচ্চতম দার্শনিক ধর্মসমূহের অন্যতম বৌদ্ধধর্ম ভারতের আপামর সাধারণ সকলের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল। ভেবে দেখ দেখি, আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে আর্যদের সভ্যতা ও শিক্ষা কি অদ্ভুত ছিল, যাতে তারা ঐরূপ উচ্চ উচ্চ ভাব ধারণা করতে পেরেছিল ! (৪:১৮৯)

ক্রমে অশোক মহারাজার আমলে তাঁর ছেলে মাহিন্দো আর মেয়ে সংঘমিত্রা সন্ন্যাস নিয়ে ধর্ম প্রচার করতে সিংহল টাপুতে উপস্থিত হলেন। দেখতে দেখতে সিলোনিরা বেজায় গোঁড়া বৌদ্ধ হয়ে উঠল। লঙ্কাদ্বীপের মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড শহর বানালে, তার নাম দিলে অনুরাধাপুরম্ , এখনও সে শহরের ভগ্নাবশেষ দেখলে আক্কেল হয়রান হয়ে যায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ, ক্রোশ ক্রোশ পাথরের ভাঙা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সিলোনময় নেড়া মাথা, করোয়াধারী, হলদে চাদরমোড়া ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ছড়িয়ে পড়ল। জায়গায় জায়গায় বড় বড় মন্দির উঠল–মস্ত মস্ত ধ্যানমূর্তি, জ্ঞানমুদ্রা করে প্রচার-মূর্তি, কাত হয়ে শুয়ে মহানির্বাণ মূর্তি–তার মধ্যে। (৬:৭০)